টাকার কথা

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

মডার্ণ বুক এজেন্সী
১০, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা হইতে
প্রকাশিত

মূল্য পাঁচ সিকা

আর্ট প্রিণ্টার্স
১৪, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হইতে
অতুলকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

যিনি

বিমাতার গৃহে অনাদৃতা ভাষা-জননীকে

সমাদরে

সম্মানের আসন দিয়া

বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির ইতিহাসে

নূতন অধ্যায় খুলিয়া গিয়াছেন

যিনি

বাঙ্গালার শিক্ষা-আয়তনে

বাঙ্গালীর ভাবাদর্শকে

নূতন মন্ত্রে

সঞ্জীবিত করিয়া গিয়াছেন

সেই

ভারতীয় কৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ

প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ-সিংহ

৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

অমর স্মৃতি উদ্দেশে

ভূমিকা

প্রায় দুবছর আগে আমি প্রবাসী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অনাথ গোপাল সেন নামক কোনও নূতন লেখকের 'স্বর্ণমান' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়ে চমৎকৃত হয়ে যাই। এবং এই অপরিচিত লেখকের প্রবন্ধ সম্বন্ধে উদয়নে নিম্নোদ্ধৃত প্যারাগ্রাফটি লিখি।

"Gold Standard ইকনমিকসের একটি জটিল সমস্যা। সে যাই হোক Gold Standardএর পক্ষে কি বলবার আছে শ্রীযুক্ত অনাথ গোপাল সেন অতি সহজ ভাষায় অতি বিষদ ভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। পরিভাষার সাহায্য তাঁকে এক রকম নিতেই হয় নি।

"পরিভাষার অনেক গুণ থাকতে পারে, কিন্তু তার মহাদোষ হচ্ছে এই যে অনেক শাস্ত্রী ঐ পরিভাষাকেই শাস্ত্র মনে করেন। তখন এই শাস্ত্রের পণ্ডিতে পণ্ডিতে বোঝাপড়া হতে পারে কিন্তু আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।" (উদয়ন, শ্রাবণ ১৩৪০)

এরকম স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গায়ে পড়ে স্তুতিবাদ করবার কারণ কি? কারণ এই যে, আমি ইতিপূর্ব্বেই লিখেছিলুম যে, "এ যুগের নব পলিটিকাল সমস্যা একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় সবই বর্ণচোরা ইকনমিক্ সমস্যা।" উপরন্তু এ যুগের সর্ব্ব প্রধান সমস্যা হচ্ছে, বিশ্বমানবের জীবন মরণের সমস্যা—যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে গত ইউরোপীয় যুদ্ধ। এ সমস্যার কোন চূড়ান্ত মীমাংসা করা অবশ্য আমাদের পক্ষে অসাধ্য; তবুও এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। জীবন এ যুগে অনেকটা মনের অধীন।

জীবনে যখন কোন বড় সমস্যা উপস্থিত হয় তখন মানুষ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। অধিকাংশ লোকেই দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হয়। কিন্তু

দুশ্চিন্তা দুরবস্থার কোনও প্রতিকারের উপায় দর্শাতে পারে না। আমরা অসুস্থ হলেই ডাক্তারের দ্বারস্থ হই—তেমনি ধনের দুর্ভিক্ষ হলে ইকনমিক শাস্ত্রীদের দ্বারস্থ হওয়াই এ যুগে আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। অন্ততঃ তাঁরা বলতে পারবেন যে বর্ত্তমান রোগটা সুসাধ্য কি দুঃসাধ্য অথবা অসাধ্য। অবশ্য কোন চিকিৎসকই মানুষকে অমর করতে পারেন না, তাহলেও উক্ত শাস্ত্রের দিন দিন উন্নতি হচ্ছে।

কোনও ইকনমিক শাস্ত্রীই এই বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি হতে উদ্ধার পাবার অদ্যাপি কোনও পথ দেখাতে পারেন নি। তথাপি তাঁদের সে আলোচনার যথেষ্ট মূল্য আছে। কারণ তাঁরা এ দুরবস্থার কতকগুলি কারণ আবিষ্কার করেছেন। আমরা যার কারণ জানি আমাদের বিশ্বাস সে কারণ দূরীভূত করবার শক্তিও আমাদের আছে। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলের কিঞ্চিৎ জ্ঞান। কোনও চিকিৎসক কাউকেও রোগমুক্ত করতে পারেন না, যদি রোগীর দেহ ও মন সে মুক্তির অনুকূল না হয়। এর থেকে অনুমান করছি যে এ ক্ষেত্রেও লৌকিক চিন্তাই ইকনমিক শাস্ত্রের সহায়।

আমি অবশ্য ইকনমিক শাস্ত্রীদের হয়ে এ দাবী করছি নে, যে তাঁরাই সমাজের আর্থিক বিষয়ের সকল গূঢ় তত্ত্ব অবগত আছেন। ইকনমিক্স শাস্ত্রের কথা অবশ্য বেদবাক্য নয়। তথাপি এ বিষয়ে তাঁরা কিছু জানেন—অপর পক্ষে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সম্পূর্ণ অজ্ঞতার কোন সুফল নেই, কারণ মানসিক অন্ধকারের মধ্যে আমরা হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ি। আমাদের অবস্থাও হয়েছে তাই।

আমি পূর্ব্বে একবার লিখি যে—"ইকনমিকসের বিধি নিষেধ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন, কেন না সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ বিষয়ে কিছু জানবার আমাদের কৌতূহল পর্য্যন্ত নেই।" তারপর আমি লিখি :—

"ইকনমিকস সম্বন্ধে আমাদের এ অজ্ঞতা এবং ঔদাসীন্যের অনেক কারণ আছে। তার ভিতর একটি স্পষ্ট কারণ এই যে, বঙ্গ সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত ইকনমিকসের স্থান নেই। ইকনমিকস শাস্ত্রের যদি বাঙালা ভাষায় প্রচার হত তাহ'লে এবিষয়ে কোনরূপ মত দেবার অধিকার আমাদের না জন্মালেও ইকনমিকস শাস্ত্রীদের মতামত বোঝবার অধিকার আমরা লাভ করতুম।"

মনের কি অবস্থায় ও কি বিশ্বাস বশতঃ আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেনের উক্ত প্রবন্ধের গুণগান করি, তাই বোঝাবার জন্য আমি আমার পূর্ব্ব লিখিত প্রবন্ধ থেকে আমার মতামত উদ্ধৃত করছি।

আমি ইকনমিকসের অধ্যাপকও নই, ছাত্রও নই—সুতরাং আমার বিদ্যা জাহির করবার জন্য উক্ত প্রশংসা-পত্র লিখিনি। যে লেখা পড়ে মন খুসী হয়, সে লেখার তারিফ করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক; তা' ছাড়া আমার উদ্দেশ্য ছিল,—লেখককে উৎসাহ দেওয়া এবং শ্রীযুক্ত অনাথ গোপাল সেনের আলোচনার প্রতি পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। পাঠক সমাজ যে এ শাস্ত্র সম্বন্ধে উদাসীন, তার প্রধান কারণ যে বাঙালা ভাষায় এ শাস্ত্রের সর্ব্বলোকবোধ্য আলোচনা হয় না। আমরা কেউ আর এ বিষয়ে স্বেচ্ছায় অজ্ঞ থাকতে চাইনে। আমাদের মনের খোরাক এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা যোগান না বলেই এ বিষয়ে আমাদের মাথা খালি রয়েছে।

আমার প্রথম উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয়েছে, তার প্রমাণ শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন পরপর আরও অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর লেখার যে গুণে আমি মুগ্ধ হই সে গুণ এই পরবর্ত্তী লেখাগুলিতেও আছে। তাঁর ভাষা সরল, আর বক্তব্য কথা তিনি গুছিয়ে বলতে পারেন। নিজের জ্ঞানকে একটা পরিচ্ছিন্ন রূপ দেওয়া

অতি কঠিন ব্যাপার, বিশেষতঃ যে জ্ঞান—অসংখ্য facts-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ এই সকল facts স্থূল দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী—অন্ততঃ একপর্য্যায়ভুক্ত নয়। এই পুস্তকে "ভারতে মুদ্রানীতি" নামক প্রবন্ধ পড়ে দেখবেন যে তার ভিতর লেখক কি পরিশ্রম ও কি অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রবন্ধটি আমাদের ঘরের কথার আলোচনা; আমাদের জাতীয় লাভ লোকসানের হিসাব নিকাশ। সুতরাং এ দেশের মুদ্রার হালচাল সম্বন্ধে আমাদের কতকটা জ্ঞান থাকা উচিত।

অবশ্য—শ্রীযুক্ত অনাথ গোপাল যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলেছেন, তা অবশ্য নয়। কেন না ইউরোপের কোন ইকনমিষ্টই অর্থের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নৈসর্গিক নিয়ম আবিষ্কার করেন নি। তার কারণ, মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যের উপরই অনেকটা নির্ভর করে। তাই আমরা মনগড়া বিধি নিষেধ সব গড়ে তুলি। আর মানুষের মনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ইকনমিক শাস্ত্রও বদলে যায়। Bolshevic ইকনমিকস কি ইউরোপের সনাতন ইকনমিকস? এ বিষয়েও লেখক এ পুস্তকে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন।

আমি আশা করি, শ্রীযুক্ত অনাথ গোপাল সেনের "টাকার কথা" সমাজে বহুল প্রচার হবে। আমাদের মধ্যে যাঁরা পলিটিকস সম্বন্ধে চিন্তা করেন তাঁরা এ পুস্তক পাঠে তাঁদের চিন্তার পরিধি বাড়িয়ে নিতে পারবেন, আর যাঁদের কাছে সাহিত্য সম্বন্ধে আমার মতামতের কিছু মূল্য আছে তাঁদের বলি, যে এ পুস্তক সাহিত্য-পর্য্যায়ভুক্ত, ইকনমিকসের নিরস Text Book নয়।

বালিগঞ্জ, কলিকাতা

২৯শে শ্রাবণ, ১৩৪২

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

লেখকের নিবেদন

এই প্রবন্ধগুলি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইলে পর অনেকেরই ভালো লাগিয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সর্ব্বপ্রথম স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া উদয়নের একাধিক সংখ্যায় আমার এই লেখাগুলির সুখ্যাতি করেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার ন্যায় "সাহিত্যের ওস্তাদ জহুরী" ও বিচক্ষণ সমালোচকের এই প্রশংসা আমাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহদান করিয়াছিল। তাই এই প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার সময়েও তাঁহারই দেওয়া ভূমিকার টিকা ললাটে লইয়া বাহির হইল।

এই পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধটি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, অধুনা লুপ্ত "অভ্যুদয়" পত্রে, পরবর্ত্তী চারিটি প্রবন্ধ "প্রবাসী"তে এবং শেষ প্রবন্ধ দুইটী "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইয়াছিল। বাংলা ভাষায় অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার কারণ আমার প্রথম প্রবন্ধ হইতে অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, এই প্রবন্ধগুলি ধনবিজ্ঞানের কতগুলি কঠিন সূত্রের ইংরাজি-বাংলায় লিখিত নিরস পণ্ডিতী ব্যাখ্যা নহে। বিষয়গুলি চিত্তাকর্ষক ও সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যাগুলির স্বরূপ সহজ বাংলায় অনেকটা গল্পের (narrationএর) মত করিয়া লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। তারপর সেগুলিকে অর্থশাস্ত্রের সূত্র দ্বারা বিচার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে

পথের ইঙ্গিত দিবার চেষ্টা করিয়াছি। সমস্যার স্বরূপ, শাস্ত্রের বিধান, ও মুক্তির পথ সম্বন্ধে পাঠকের সম্মুখে যাহাতে যুগপৎ একটি সহজ সুস্পষ্ট ছবি ফুটিয়া ওঠে এবং তিনি নিজেও স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার মত আন্তরিকতা লাভ করিতে পারেন, যথাসাধ্য সেরূপ প্রয়াস পাইয়াছি। কতদূর সফল হইয়াছি তাহা সুধী পাঠকগণের বিচার্য্য। যাহা হোক অর্থনীতি আলোচনা সম্পর্কে এই লেখাগুলি যদি সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের মনে কিঞ্চিন্মাত্রও উৎসাহ দান করে, এবং বাংলা ভাষায় ভবিষ্যৎ আলোচনার পথ সুগম করিতে সহায়তা করে, তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

৩০২, আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা।
রাস পূর্ণিমা, ১৩৪৩

বিনীত—
শ্রীঅনাথ গোপাল সেন

সূচিপত্র

রাজনীতি বনাম অর্থনীতি

আমরা রাজনীতি ব্যাপারে সহজেই তাতিয়া ও মাতিয়া উঠিতে শিখিয়াছি; কিন্তু ব্যবসায়, বাণিজ্য, অর্থনীতি ব্যাপারে আমাদের ধারণা আজও অস্পষ্ট। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা যদিও আজ ঠেকিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তথাপি তৎসম্বন্ধে আমাদের অধ্যবসায়, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অভাব। আর জাতীয় বা আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতি সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাই আমরা আজ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারি নাই। অথচ রাজনীতি বা পলিটিকস্ লইয়া এত যে রেষারেষি, দ্বন্দ্ব তাহার মূলে রহিয়াছে ব্যবসা, বাণিজ্য ও অর্থনীতি। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিবার চেষ্টা করা যাক। পলিটিক্স্ বলিতে আমরা মোটামুটি বুঝি, বিভিন্ন দেশের রাজ্য-শাসন-প্রণালী ও তাহাদের অন্তর্নিহিত মূলনীতি এবং পরস্পরের বিরোধী স্বার্থের সামঞ্জস্য-সূচক সূত্রগুলি। এই নীতি ও সূত্রগুলির অন্তর্নিহিত প্রেরণা রহিয়াছে দেশাত্মবোধে ও নিজ নিজ জাতীয় কল্যাণ কামনায়। কিন্তু ইহাদের চরিতার্থতা রহিয়াছে দেশের অর্থোন্নতি ও ধনসম্পদ সমৃদ্ধিতে। অবশ্য পলিটিকসের ইহাই চরম সার্থকতা নহে। মানুষের দৈহিক, আর্থিক, আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ উৎকর্ষসাধন এবং সকল ক্ষেত্রে তাহার আভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশই তাহার চরম লক্ষ্য। কিন্তু সত্যযুগের (golden age) ব্যবস্থা যেরূপই থাকুক না কেন এবং অর্থকে যতই অনর্থের মূল বলিয়া ভাবি না কেন, বর্ত্তমান কালে স্বর্ণ ও রৌপ্য চক্রকেই সকল উন্নতির মূল ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এবং উহারই মধ্যে সকল সিদ্ধির মাপকাঠি

রহিয়াছে। তাহা হইলে এক কথায় দাঁড়াইতেছে এই যে, দেশের পলিটিক্স্ বা রাজনীতি দেশের আর্থিক উন্নতি চেষ্টারই নামান্তর মাত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা শিক্ষিত বাঙ্গালী বা ভারতবাসী দেশাত্মবোধের প্রেরণা লাভ করিয়া পলিটিক্সে মাতিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য (implications) বা উদ্দেশ্য (goal) আজও আমাদের দৃষ্টির বাহিরে রহিয়া গিয়াছে—উহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারা বা হৃদয়ঙ্গম করা ত দূরের কথা। আত্মকর্ত্তৃত্ব, স্বরাজ, স্বাধীনতা আমাদের চাই। কেন চাই?—কারণ উন্নতিশীল সকল জাতিরই ইহা আছে, ইহা না হইলে আমাদের উন্নতির কোন আশা নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহার অভাব বর্ত্তমান যুগে আমাদের শিক্ষিত আত্মাভিমানে ঘা দেয়। এই পর্য্যন্তই আমাদের দাবীর জোর। কিন্তু কেন আমাদের উন্নতি হইতেছে না, কোন দিক দিয়া কি ভাবে উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া আছে, স্বাধীনতা পাইলে অসংখ্য সমস্যাগুলির মীমাংসা কি ভাবে, কোন পথে করিব, এই সব বিষয়ে আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের কোন ধারণা নাই। সমস্যাগুলির প্রকৃতিই আমরা ভাল করিয়া জানি না; তাহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিব কি প্রকারে? টাকার দর ২।১ পেনি নড়চড় করিয়া দিলে দেশের কোটি টাকা কদিনে বাহির হইয়া যাইতে পারে তাহা আমাদের মধ্যে কজনা জানেন?

য়ুরোপ ও আমেরিকা উন্নতির উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পূর্ণ আত্মকর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করিয়াও কালের গতির বর্ত্তমান পরিণতির ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া চোখে অন্ধকার দেখিতেছে, নিজ নিজ দেশ ও জাতিকে বাঁচাইবার পথ পাইতেছে না। আর আমরা—রাজনীতি অর্থনীতির এত বড় প্রলয়ঙ্কর বিপর্য্যয়ের মধ্যে বাস করিয়াও শক্তিশালী জাতিসমূহের আত্মরক্ষার বিপুল প্রচেষ্টার পরিচয়টুকু পর্য্যন্ত রাখি না,

নিখিল মানবের স্বার্থ-সামঞ্জস্য ও ভাগবাটোয়ারার দরবারের সংবাদ রাখার প্রয়োজন বোধ করি না। স্বাধীনতা বা আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিলেই আমরা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিব কি করিয়া? কারণ "স্বাধীনতা" জিনিসটা আপনা হইতে মুহূর্ত্তে সকল অকল্যাণ অপনোদন করিতে পারে না। এই জিনিসটার এমন কোন সম্মোহন শক্তি নাই। দেশের প্রতিভা ও যোগ্যতা স্বাধীনতাকে সুপথে পরিচালিত করিতে পারিলেই তবে অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও অভাব আস্তে আস্তে ঘুচিবে। স্বাধীনতাকে ব্যবহার করা যে কত কঠিন য়ুরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমান অবস্থা-সঙ্কট দেখিয়া আমাদের শিক্ষা লাভ করা উচিত। অথচ দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের মধ্যে নিরানব্বই জন শিক্ষিত gold standard বলিতে কি বুঝায়, stabilisation of exchange কাহাকে বলে, tariff war টা কি, Ottawa agreement কাহাদের মধ্যে কেন হইল জানেন না। অথচ সংবাদপত্র পাঠের সময় শব্দগুলি সর্ব্বদাই হেঁয়ালির মত তাহাদের চোখের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাঁহারা এগুলিকে এড়াইয়া চলেন। সেদিন ভারতীয় পরিষদে Anti-dumping Bill পাশ হইয়া গেল। ইহা লইয়া জাপানের সহিত ইংলণ্ডের একটা আন্তর্জ্জাতিক মনোমালিন্য সৃষ্টির কারণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বহুকালের ব্যবসাসর্ত্ত রদ হইয়া যাইতেছে। ইহার ফলে ভারতের বয়নশিল্পের উন্নতি হইবে, কি লেঙ্কাশায়ারের সুবিধা হইবে তাহা লইয়া মতদ্বৈধ হইয়াছে, আলোচনাও চলিতেছে। এই নূতন আইনের প্রতিক্রিয়া অন্য জাতির উপর কার্য্য করিতে সুরু করিয়াছে। মোটের উপর এই নিয়া ব্যবসা ও অর্থজগতে বেশ একটা আলোড়ন পড়িয়া গিয়াছে—কিন্তু যাহাদের ঘরের মধ্যে এই ব্যাপার তাহাদের কয়জন এটা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন?

"হাওয়া গাড়ী" পেট্রলে চলে এই তথ্যটুকু আমরা সহরবাসীরা জানি। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ পয়সা দিয়া পেট্রল কিনিয়া হাওয়া গাড়ী হাঁকাইয়াও থাকি। অজ্ঞ গ্রামবাসীদের অবস্থা মনে করিয়া তখন আমাদের অনেকের মনে আনন্দ ও গর্ব্বের সঞ্চারও হয়ত হয়। কিন্তু এই তরল পদার্থটির শক্তি যে কি ব্যাপক, ইহা নিয়া বড় বড় শক্তি সমূহের মধ্যে কত বড় অগ্নি দাহের সম্ভাবনা সর্ব্বদা বিদ্যমান, ইহার উপর কর্তৃত্ব লাভের জন্য রেষারেষির অন্ত নাই, ইহার ফলে কত নিরীহ দেশের প্রাণান্ত হইতেছে—এই সব খবর শিক্ষাভিমানী কয়জন সহরবাসী আমরা রাখি? কখনো ৷৶০ আনা, কখনো ১।৴১০ দরে পেট্রল কিনি—'কেন" প্রশ্নের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই।

League of nations এর উদ্দেশ্য কি, ইহার সহিত ভারতের কি সম্পর্ক, Kellog Pact দ্বারা কি সাধিত হইয়াছে, বড় বড় ধুরন্ধরগণ এতগুলি disarmament conference, World economic conference বসাইয়া মানব জাতির ভাগ্য কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন—তাহার খবর আমরা কয়জন শিক্ষিত রাখি? ভারতের কি ইহাতে কিছুই আসে যায় না? বিশ্বরঙ্গমঞ্চে প্রতিপক্ষকে মাত করিবার জন্য এই যে দাবাখেলা চলিয়াছে আমরা কি তাহাতে শুধু unconscious pawn হইয়াই থাকিয়া যাইব? এ সব বৃহৎ ব্যাপারের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, দেশের ক্ষুদ্র ব্যাপার যাহার সহিত সাক্ষাৎভাবে আমাদের ভালমন্দ গুরুতররূপে নির্ভর করে এমন একটি দৃষ্টান্ত হইতেও আমরা বুঝিতে পারিব আমরা নিজেদের মঙ্গল সম্বন্ধে কিরূপ উদাসীন হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছি।

বঙ্গদেশে কিছু দিনের মধ্যে অনেকগুলি লোন আফিস বা ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিশেষভাবে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের সহর ও বন্দর ইহারা

ছাইয়া ফেলিয়াছিল। এই সব ব্যাঙ্কে বাঙ্গালীর প্রায় ৭।৮ কোটি টাকা খাটিত এবং এই ব্যাঙ্কগুলি কৃষক ও ভূম্যধিকারীর মধ্যেই দাদনের কাজ করিত। এক হিসাবে Land Mortgage Bank-এর উদ্দেশ্যই ইহারা পূরণ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু পাট ও খাদ্যশস্যের মূল্য অত্যধিক হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় অধিকাংশ ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করিয়াছে। ফলে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে এমন একটা গুরুতর আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে যাহা একেবারে অভাবনীয়। এক কথায় এই ব্যাঙ্কগুলির দরজা বন্ধ করার ফলে, মফঃস্বলের সচ্ছল ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রায় যাবতীয় সঞ্চয় হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়াছে এবং কৃষক সম্প্রদায়ের—প্রতি বৎসর প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাইবার স্থানও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইয়াছে। এমন একটা সময়ে আমাদের এই সঞ্চিত অর্থ হারাইয়াছি, যখন বর্ত্তমান রোজগার আমাদের সঙ্কটাপন্ন এবং সঞ্চিত তহবিলের ভরসাই প্রধান সম্বল হইবার কথা। এই কঠিন অবস্থা বিপন্নদের প্রতি দেশের নেতৃবৃন্দের ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে আমি "অমৃত বাজার পত্রিকা"য় একটি পত্র প্রেরণ করি—এবং জনৈক বন্ধুর দ্বারাও ঐ সম্বন্ধে ঐ সংবাদপত্রেই আরো একটি পত্র প্রকাশ করি। এই সমস্যাকে মূর্ত্তিমতী করিয়া—অমৃত বাজার পত্রিকা তাহার সম্পাদকীয় স্তম্ভে একাধিক প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় এই যে, এই সব লোন আফিসের কর্ম্মচারীগণের অনেকেই শিক্ষিত উকিল, মোক্তার ও নেতৃস্থানীয় হওয়া সত্ত্বেও এই আলোচনায় যোগদান করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। দেশের অপর কাহাকেও এই আলোচনা করিতে দেখা গেল না। অথচ সেই সময়েই "নারী অত্যাচারী পুরুষকে অধিক ভালবাসে কিনা" এই রুচিকর sex-psychology লইয়া আমাদের অনেকেই অমৃত বাজার পত্রিকার পত্রস্তম্ভে মাতিয়া উঠিলেন!

এবং তৎপরেই গোঁফবিহীন ও গোঁফবিশিষ্ট এই দুই জাতীয় পুরুষের মধ্যে কে নারীজাতীর অধিকতর মনোনয়ন করিতে সক্ষম তাহার আলোচনায় অনেকেই পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন। গোঁফকে শিখণ্ডী দাঁড় করাইয়া লেখনী দ্বারা কতটা রমণী-মন জয় করা যায় এক্ষণে সম্ভবতঃ তাহার প্রতিযোগীতায় আরো কিছুদিন কাটিবে। রাজনীতি, অর্থনীতি বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন এবং সম্পদারূঢ় হইয়াও আজ পাশ্চাত্য জাতিসমূহের চোখের নিদ্রা ঘুচিয়াছে। আর আমরা সর্ব্বহারা হইয়াও sex-psychology, moustache or no moustache, Miss Bengal 1935 লইয়া বিব্রত!

পাশ্চাত্য দেশ জানে কারণ ছাড়া কার্য্য ঘটে না। আমরা শিখিয়া রাখিয়াছি, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। উহাদের মধ্যে অকল্যাণ আসিলে তাহারা কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার প্রতিকার না করা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হয় না। আমাদের দেশের আপামর সাধারণের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, শিক্ষিতেরাও নসিবের স্কন্ধে সকল অপরাধ চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকাই শ্রেয় মনে করেন।

জনৈক আমেরিকান লেখক চিনাদের জনমত আলোচনা সম্পর্কে সম্প্রতি লিখিয়াছেন, "When the price of grain drops, the American farmer has little difficulty in persuading himself that sinister and immoral forces have caused his misfortune and that Governmental measures for redress are in order. The Chinese husband-man feels that a low cash return on his rice-crop is a part of his destiny, confirmed by centuries of experience and is to be borne with silent stoicism." আমরা শিক্ষিত ভারতবাসীই কি এই মনোবৃত্তি

ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিয়াছি কিম্বা বাহ্যতঃ সেইরূপ প্রমাণ দিতেছি?

কথা হইতে পারে, স্বাধীনতার জন্য আমরা অপেক্ষা করিয়া আছি। স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলেই সব দোষ, সব ত্রুটি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব। জিজ্ঞাসা করি, সব দোষ কি স্বাধীনতারূপ সোণার কাঠির স্পর্শমাত্রেই দুর্দিনের ভিতর গুণে পরিণত হইবে? তারপর প্রশ্ন এই, যোগ্যতা না আসিলে স্বাধীনতাই বা পাইব কি প্রকারে? তৃতীয়তঃ, আমরা এমন কোন যোগ্যতার কথা এখানে আলোচনা করিতেছি না যাহা দেশ আত্মকর্তৃত্ব লাভ না করা পর্য্যন্ত অর্জ্জন করা যায় না কিম্বা চেষ্টার সূচনা করা যাইতে পারে না। দলে দলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যুবকগণ বাহির হইতেছেন। তাহাদের পক্ষে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের দরজা উন্মুক্ত পড়িয়া রহিয়াছে। এবং আহৃত জ্ঞান আংশিক প্রয়োগের ক্ষেত্রও যথেষ্ট রহিয়াছে। এই বিষয়ে বাঙ্গালীই সকল প্রদেশের পশ্চাতে। উচ্চ শ্রেণীর কবি, সাহিত্যিক, আর্টিষ্ট, বৈজ্ঞানিক, বাগ্মী, ধর্ম্মগুরু ও সমাজসংস্কারকের জন্ম এই বাংলার মাটিতে যে পরিমাণ হইয়াছে তাহা নিয়া আমাদের শ্লাঘা করিবার আছে। কিন্তু business magnate বা financial expert বলিতে যাহা বোঝায় সে রকম ব্যক্তি ২।৪টি ও খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। বড় ব্যবসায়ী হিসাবে, ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" স্যার রাজেন্দ্রের নামই করিতে হয়। অর্থ-নৈতিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে বাংলার ঘরে শূন্য দিলেই চলে। আজ কয়দিন হইল শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় দেখিতেছি নিখিল ভারত ব্যবসা-সঙ্ঘের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাঙ্গালী সব বিষয়ে বক্তৃতা করিতে পারে কিন্তু বর্ত্তমান জগতের সারতত্ত্ব

ব্যবসা ও অর্থনীতির কথা উঠিলেই সরিয়া দাড়ায়। অথচ বিষয়টাকে যতদূর দুরূহ ও রসহীন বলিয়া আমরা মনে করি প্রকৃতপক্ষে উহা মোটেই সেরূপ নয়। যদি তাহাই হইত তবে অবাঙ্গালীরা ব্যবসা বাণিজ্যে এত উন্নতি করিতে পারিত না। তাহাদের অনেকে ইংরাজী অনভিজ্ঞ হইয়াও পৃথিবীর টাকার বাজারের সমস্ত সংবাদ নখাগ্রে রাখিতেছেন এবং আমদানী রপ্তানী ব্যবসা ও share speculation করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন। প্রতি বৎসর এতগুলি প্রথম শ্রেণীর এম-এ, বি-এ, এতকাল ধরিয়া বিদ্যালয় হইতে বাহির হইতেছেন কিন্তু নিখিল ভারত ব্যবসা-সঙ্ঘের প্রথম বাঙ্গালী সভাপতি তাহাদের কেহ হন নাই। যিনি হইয়াছেন তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী নাই। অপরিসীম উৎসাহ, অসাধারণ অধ্যবসায় ও অক্লান্ত চেষ্টা তাঁহাকে এই পদের যোগ্য করিয়াছে। চাই শুধু বর্ত্তমান জগতে জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে এই জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি ও তাহার অনুকূলে তদনুরূপ চেষ্টা।

—০:+:০—

স্বর্ণমান

বর্ত্তমান সময়ে আমরা সকলেই অর্থসঙ্কটের ফল কম-বেশী ভোগ করিতেছি। এমন কি ঐশ্বর্য্যশালী ইউরোপ ও আমেরিকার অবস্থাও কাহিল। সুখ ও সম্পদের একটানা ঊর্দ্ধগতির পথে হঠাৎ শনির দৃষ্টি উহাদের উপরও পড়িয়াছে। ঊর্দ্ধরেখা নীচের দিকে নামিতে সুরু করিয়াছে। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই ছিল তাহাদের মূলমন্ত্র। এদিকে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা কমিতেছে, বিশ্বের হাটে মূল্য যাহা মিলে তাহাতে খরচ পোষায় না। আবার সকল দেশই নিজের পণ্য অন্য দেশে পাঠাইয়া নিজের কোলে সমস্ত ঝোল টানিতে চান। কেহই পরের দ্রব্য পারতপক্ষে ক্রয় করিবেন না: তাহার জন্য ফন্দিফিকিরের অন্ত নাই। ফলে বাণিজ্য হইয়াছে অচল—কলকারখানার মজুর, কারিগর ও কৃষক বসিয়াছে পথে। প্রাসাদ ও ঐশ্বর্য্যের মাঝেও বেকারসমস্যা তাহার বিরাট ও বিকট মূর্ত্তি লইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থনীতিবিশারদ না হইয়াও আমরা এই সহজ সত্যটুকু চোখে দেখিতেছি ও বুঝিতেছি যে, সকল দেশের কাঁচা ও তৈয়ারী মালের চাহিদা ও দর কমিয়া যাওয়াতেই এই সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। দেশের সম্পদ যাহারা হাতে-নাতে সৃষ্টি করে (producers of wealth) তাহাদের হাত যখন শূন্য হইতে সুরু হইল, সঙ্গে সঙ্গে আর সকল শ্রেণীর অবস্থাও হইল কাহিল; কারণ আর সকলে তাহাদের ধনে পোদ্দারী করেন মাত্র। এই পর্য্যন্ত আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি। কিন্তু জিনিষের চাহিদা ও

দরের হঠাৎ এরূপ নিম্নগতি হইল কেন; আবার কি করিলে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি পাইবে; আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতির সহিত এ সমস্যার সম্বন্ধ কোথায়; স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিলেই দেশ-বিশেষের বাণিজ্যের উন্নতি কি পরিমাণ হইতে পারে; বিভিন্ন দেশের অর্থের বিনিময়ের হার অ-স্থির ও অনির্দ্দিষ্ট হওয়ায় কি প্রকারে ব্যবসার ক্ষতি হয়, উনবিংশ শতাব্দীর অব্যাহত বাণিজ্যনীতির পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান কালের রক্ষণশীল নীতি কি ভাবে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছে; পৃথিবীব্যাপী ঋণের গুরুভার, বিশেষতঃ সমর-ঋণের নিষ্ঠুর চাপ, পৃথিবীর কতখানি শ্বাসরোধ করিতেছে—এ সব জটিল প্রশ্ন যখন ওঠে তখন তৎসম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত বাঙালীদের ভাবিবার বা বলিবার কিছু থাকে না। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে আমরা যদি টিকিতে চাই তাহা হইলে এই সব ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। চারিদিকে মুক্তিপথের সন্ধান চলিয়াছে। বৈঠক ও পরামর্শের শেষ নাই। আমাদের অনেকের মনেও এক্ষণে এ-সব বিষয়ে কিছু জানিবার আগ্রহ হইয়াছে। তাই আজ অর্থনীতির গোড়ার কথা 'স্বর্ণমান' সম্বন্ধেই প্রথম আলোচনা করা যাক।

কর্ম্মবিভাগ, বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের সহজ বিনিময়ের উপায় ও স্বোপার্জ্জিত ধনে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার—এই কয়টিকে মূল ভিত্তি করিয়া আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক জগৎ প্রতিষ্ঠিত। কোন সমাজ যখন আত্মসর্ব্বস্ব হইয়া নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে স্বল্প অভাব লইয়া বসবাস করে কেবল তখনই 'বার্টার' অর্থাৎ দ্রব্যবিনিময়ে বেচাকেনার কাজ চলিতে পারে। আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিমাণ যখন নগণ্য ছিল এবং নিজের দেশেই ভিন্ন জনপদের সহিত

আমাদের বেচাকেনার সম্পর্ক অতি সামান্য ছিল, তখনই আমরা ধানের পরিবর্ত্তে দেশী জোলার গামছা, কামারের দা ও লাঙ্গলের ফাল কিনিতে পারিতাম। কিন্তু বর্ত্তমান কালে ধান চাল দিয়া আমরা বিলাতী মোটর গাড়ী, এমন কি কাশ্মীরী শাল কিনিতে পারি কি? কাজেই যখন একই দেশের বিভিন্ন গ্রাম বা সহরে নহে, একেবারে বিভিন্ন দেশে অসংখ্য রকম পণ্য তৈরী হইতে আরম্ভ হইল এবং তাহাদের মধ্যে অবাধিত বিনিময় চলিতে লাগিল তখন আদিম যুগের 'বার্টার' পন্থায় আর কাজ চলিতে পারিল না। এইরূপ অসংখ্য পণ্য-বিনিময়ের হিসাব ঠিক রাখিবার জন্য একটা মধ্যস্থ মাপকাঠি স্থির করিয়া লইতে হইল। আমরা যদি আজও সেই 'বাটার'এর যুগেই থাকিতাম তাহা হইলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের এরূপ বিরাট ও দ্রুত প্রসার হইতে পারিত না। যে মধ্যস্থ মাপকাঠির কথা এইমাত্র উল্লেখ করিলাম তাহারই নাম অর্থ (Money)। অর্থশাস্ত্রে অর্থকে ধন বা সম্পদের প্রতিভূ মাত্র বিবেচনা করা হয়। দেশের ধন বা সম্পদ বলিতে সেই দেশের অর্থকে বুঝায় না, সেই দেশের কাঁচা বা তৈরী মাল—বিশ্বের হাটে যাহার চাহিদা আছে—তাহাকেই বোঝায়। অর্থ বা টাকা কাগজের তৈরি নোটও হইতে পারে, তাহার ত নিজের কোন মূল্যই নাই। রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রা হইলে তাহাদের মধ্যস্থিত ধাতুর যাহা বাজার দর ঐটুকুই দেশের সম্পদ হিসাবে তাহার কদর। পণ্যবিনিময়ের সুবিধার জন্য এই যে প্রতিনিধিত্বের সৃষ্টি হইয়াছে, ভিন্ন দেশে ইহার ভিন্ন নাম ও ভিন্ন মূল্য। ইংলণ্ডের মুদ্রা পাউণ্ড ষ্টার্লিং নামে পরিচিত, আমেরিকার মুদ্রার নাম ডলার, ফ্রান্সের মুদ্রাকে ফ্রাঁ্যা বলা হয়। তিনটি মুদ্রারই স্বর্ণের পরিমাণ জানা থাকায় তাহাদের বিনিময়ের হার নির্দ্ধারণ করা কঠিন হয় না। অবশ্য কোন

দেশের মুদ্রা বলিতে আমরা এক্ষণে শুধু সেই দেশের স্বর্ণমুদ্রাকেই বুঝিব না—ব্যাঙ্ক নোট, চেক ইত্যাদিকেও বুঝিব। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে ধাতব মুদ্রা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত হ্রাস পাইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে বাণিজ্যের অধিকাংশ লেন-দেন ব্যাঙ্ক নোট ও ব্যাঙ্ক চেক দ্বারাই চলিয়াছে; ধাতব মুদ্রার সহিত বাহ্যতঃ তাহার সম্পর্ক খুবই কম। কিন্তু ভিতরের ব্যাপার অন্যরূপ। আমরা তামা, নিকেল, রৌপ্য, কাগজের নোট বা চেক—যাহারই সাহায্যে পণ্য ক্রয় করি না কেন, এই সকলের পশ্চাতে পাউণ্ড, ডলার, ফ্রাঁ প্রভৃতি মুদ্রা যে ধাতুতে গঠিত সেই ধাতু সমপরিমাণে থাকা চাই। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করা যাক। এক পাউণ্ড ছাপের নোট গ্রহণ করিয়া আমি আমার পণ্য বিক্রয় করিলেও তৎপরিবর্ত্তে আমি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এক পাউণ্ডের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য পাইতে অধিকারী। ১৯৩১ সালে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক পাউণ্ড নোটের পরিবর্ত্তে, ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড হইতে ১২৩¼ গ্রেণ ওজনের সোণা পাওয়া যাইতে পারিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অধিকাংশ দেশের মুদ্রা রৌপ্যনির্ম্মিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যালিফোর্ণিয়ার সোনার খনি আবিষ্কারের সঙ্গে মুদ্রা ব্যাপারে রৌপ্যের স্থান স্বর্ণ অধিকার করিতে আরম্ভ করে। লড়াইয়ের সময় অর্থাৎ ১৯১৪ সাল ও ১৯১৯ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যাপারে একটা মস্ত ওলটপালট হইয়া যায়। এবং অধিকাংশ দেশই স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ১৯১৯ ও ১৯২৫ সালের মধ্যে প্রধান প্রধান দেশগুলির সমবেত চেষ্টায় আন্তর্জ্জাতিক স্বর্ণমান পুনরায় সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

কোন দেশের মুদ্রা স্বর্ণমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিলে আমরা কি বুঝিব? আমরা বুঝিব, (১) স্বর্ণ সেই দেশের 'লিগেল টেণ্ডার' অর্থাৎ সেই দেশে স্বর্ণের বিনিময়ে বেচাকেনা চলে; (২) আমরা সেই দেশের রাজকোষে সোনার থান দাখিল করিয়া তদ্বিনিময়ে তুল্যমূল্যের স্বর্ণমুদ্রা পাইতে পারিবো; (৩) জনসাধারণের অবাধ স্বর্ণ আমদানী ও রপ্তানীর অধিকার আছে।

এই স্বর্ণমান হইতে কি উদ্দেশ্য সাধিত হয় এক্ষণে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। প্রত্যেক দেশের মুদ্রা যদি একটা নির্দ্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণ দ্বারা গঠিত হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময়ের হারও (rate of exchange) সহজেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। যদি এক ষ্টার্লিংএ ১২৩¼ গ্রেণ, এক ডলারে ২৫ গ্রেণ, এবং এক ফ্রাঁতে প্রায় ৫ গ্রেণ খাঁটি সোনা থাকে তাহা হইলে এক পাউণ্ড ষ্টার্লিং, ৪·৮৬ ডলার ও ২৫ ফ্রাঁর সমান হইবে (কাছাকাছি হিসাব ধরা হইল)। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বিনিময়ের হার যথাসম্ভব ঠিক রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালে অধিকাংশ কেনাবেচার কাজ ধারে হওয়ায় ইহার প্রয়োজন আরও বেশী এবং স্বর্ণমান দ্বারা সেই প্রয়োজনই সাধিত হইয়া আসিতেছিল। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আমেরিকা হইতে ইংরাজ ব্যবসায়ী তুলা খরিদ করিলে তাহাকে তাহার মূল্য ডলারে হিসাব করিয়া দিতে হইবে। যদি ডলার ও ষ্টার্লিঙের মধ্যে বিনিময়ের হার নির্দ্দিষ্ট থাকে তবেই কত ষ্টার্লিং হইলে তাহার চলিবে তাহা বুঝিয়া লাভালাভ হিসাব করিয়া সে ব্যবসা করিতে পারে। এক ষ্টার্লিং = ৪·৮৬ ডলার হইলে (উভয় দেশ স্বর্ণমানে থাকা কালীন বিনিময়ের হার এইরূপ ছিল) ইংরেজ ব্যবসায়ীকে হাজার ডলার মূল্যের তুলার জন্য কত ষ্টার্লিং দিতে হইবে তাহার হিসাব

সে সহজেই করিতে পারে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে পাউণ্ড ষ্টার্লিঙের সহিত স্বর্ণের অভেদ্য সম্পর্ক ঘুচিয়া গেল, প্রত্যেক পাউণ্ড ষ্টার্লিঙের বিনিময়ে স্বর্ণ পাওয়া বন্ধ হইল, অমনি ষ্টার্লিঙের মূল্য হ্রাস পাইতে সুরু করিল। স্বর্ণ বা ডলারের সহিত তাহার বিনিময়ের হার কমিতে লাগিল ও অনির্দ্দিষ্ট হইল। যেখানে এক পাউণ্ড ষ্টার্লিং = ৪'৮৬ ডলার ছিল সেখানে বিনিময়ের হার অনির্দ্দিষ্ট হইয়া এক পাউণ্ড ষ্টার্লিঙের মূল্য ৩'৩০০ ডলার হইতে প্রায় ৪ ডলার পর্য্যন্ত অনবরত ওঠা নামা করিতে লাগিল। ফলে ইংরেজ ব্যবসায়ীকে হাজার ডলারের বিনিময়ে কেবলমাত্র যে অধিক ষ্টার্লিং দিতে হইল তাহা নহে, উপরন্তু কতটা অধিক দিতে হইবে তাহাও সে বিনিময়ের অনিশ্চয়তার দরুণ বুঝিতে পারিল না। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময়ের হার ঠিক না থাকিলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের মূল্য নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে এবং বাণিজ্য জুয়াখেলা ও ভাগ্যপরীক্ষায় পরিণত হয়।

স্বর্ণমান আর একটী বড় উদ্দেশ্য সাধন করে। প্রত্যেক নোটের বিনিময়ে স্বর্ণ দিবার সর্ত্ত থাকায় কোন গবর্ণমেণ্ট অত্যধিক নোট ছাপাইয়া চালাইতে পারেন না। কারণ নোটের বিনিময়ে স্বর্ণ দিবার জন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়। তদ্দরুণ অতিরিক্ত কাগজের মুদ্রা প্রচলিত হইয়া জিনিসের দর অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে না। কেনাবেচার জন্য যে পরিমাণ মাল দেশে আছে তদনুপাতে যদি মুদ্রার পরিমাণ বেশী (inflation of currency) হয়, তাহা হইলে যোগান ও চাহিদার সাধারণ নিয়মানুসারে জিনিষের মূল্য অপেক্ষাকৃত বাড়িয়া যাইবে। ফলে সেই দেশের জিনিষ বিদেশে কম রপ্তানী হইবে এবং বিদেশী জিনিষের আমদানী

বাড়িবে। অথচ বিদেশীকে জিনিষের মূল্য কাগজে দেওয়া চলিবে না। ফলে দেশের সোনা বিদেশে চলিয়া যাইতে সুরু করিবে। স্বর্ণমান অতিরিক্ত মুদ্রা প্রচলনের প্রতিবন্ধকতা করিয়া এইরূপে তাহার কুফল নিবারণ করে। এই ত গেল সুবিধার দিক।

একটা অসুবিধার দিকও ইহার আছে। ইহার সাহায্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিনিময়ের হার ঠিক থাকে সত্য কিন্তু কোন জিনিষের দর দেশ-বিশেষের যোগান ও চাহিদা, তৈরি খরচ, মুদ্রার পরিমাণ ইত্যাদি অবস্থার উপর ততটা নির্ভর করে না—পৃথিবীময় মোট স্বর্ণের পরিমাণ ও অন্যান্য অবস্থার উপর যতটা নির্ভর করে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ব্যবধান ঘুচিয়া যাওয়ায় কোন দেশের পণ্য আর এখন কেবল সেই দেশের পণ্য হিসাবেই গণ্য হইতে পারে না; বিশ্বের সকল হাটই তাহার খোঁজ রাখে এবং সেই কারণেই তাহার কদর দুনিয়ার হাটের অবস্থার উপর নির্ভর করে। আমরা দেখিয়াছি বিশ্বের হাটে কেনাবেচার মূল্য দেওয়া হয় স্বর্ণে। পণ্য বিনিময়ে যদি আমরা স্বর্ণ লইতে চাই তাহা হইলে পৃথিবীর পণ্যের দর পৃথিবীর স্বর্ণের পরিমাণের উপর নির্ভর করিবে। তাই বিশ্বের হাটের দর তাহার নিজ নিয়মে যেমন নিয়ত ওঠা-নামা করিতে থাকে, বিভিন্ন দেশের দরকেও তাহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে হয়। ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে এই যে, স্বর্ণমানের সাহায্যে সমগ্র পৃথিবীর সহিত ব্যবসাক্ষেত্রে আমাদের সংযোগ যেমন সহজ হইয়াছে, তেমনি আমাদের দেশের জিনিষের দর অর্থের সংকোচন ও প্রসারণ (deflation and inflation) সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি আমাদের হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আজকাল একদল লোক, যাহাদের একটা নির্দ্দিষ্ট আয়ের উপর জীবিকা নির্ভর করে, দরের এই নিয়ত পরিবর্ত্তন কিছুতেই

পছন্দ করিতে পারেন না—ভাগ্যান্বেষী দলের নিকট ইহা যতই লোভনীয় হউক না কেন।

পৃথিবীর বাজার দরের ওঠা-নামা প্রধানতঃ কি কারণে হয় এখানে তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি বিশ্বের হাটে কেনাবেচা বাহ্যত যে-ভাবেই হউক না কেন, কার্য্যতঃ ও প্রকৃত প্রস্তাবে সোনার সাহায্যেই ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহা হইলে অর্থনীতির মূলসূত্র যোগান ও চাহিদার নিয়মানুসারে বিশ্বের স্বর্ণ তহবিলের কম-বেশীর সহিত জিনিষের দর নামিবে ও চড়িবে। সোনার পরিমাণ কমিয়া গেলে জিনিষ ক্রয়কালীন আমাদিগকে বাধ্য হইয়া সোনা কম দিতে হইবে, অর্থাৎ জিনিষের দর কমিবে। পক্ষান্তরে পৃথিবীর স্বর্ণতহবিল বৃদ্ধি পাইলে জিনিষ কিনিতে অধিক সোনা দেওয়া সহজ হয় এবং জিনিষের দর বাড়িতে থাকে। সেই জন্যই দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যালিফর্নিয়ার স্বর্ণখনি আবিষ্কারের সঙ্গে পৃথিবীর বাজার-দর চড়িয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে-পরিমাণ পণ্যদ্রব্য হাটে আসিতেছে সেই পরিমাণে স্বর্ণ বৃদ্ধি পাইতেছে না। তদুপরি আমেরিকায় ও ফ্রান্সে প্রভূত স্বর্ণ অব্যবহৃত অবস্থায় আবদ্ধ আছে। চলতি সোনার এই ঘাটতি বাজার-দর পড়িয়া যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ।

ইংলণ্ড ১৯৩১ সালে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল কেন এবং এই পন্থা অবলম্বন করিয়া তাহার লাভ ক্ষতি কি হইয়াছে এক্ষণে তাহা আলোচনা করা যাক। অর্থের (currencyর) বা দ্রব্যের বিনিময়ে স্বর্ণ দিতে না পারিলেই স্বর্ণমান পরিহার করা ভিন্ন উপায় থাকে না, মোটামুটি ইহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু স্বর্ণের প্রধান হাট ইংলণ্ডে স্বর্ণাভাব ঘটিল কি করিয়া তাহাই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। এই

আলোচনা প্রসঙ্গে কি করিয়া প্রভূত স্বর্ণ আমেরিকায় ও ফ্রান্সে আসিয়া জমা হইল তাহাও আমরা বুঝিতে পারিব। ইংরেজ জাতিকে তাহাদের খাদ্যদ্রব্য, কাঁচা মাল ইত্যাদি বিদেশ হইতে অনেক পরিমাণে কিনিতে হয় বলিয়া তাহার রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী অধিক এবং বাণিজ্যের গতি (balance of trade) তাহার প্রতিকূল। ইহার অর্থ এই যে, বাণিজ্য করিয়া ইংলণ্ড বিদেশ হইতে যত টাকা পায় তদপেক্ষা বেশী টাকা তাহার বিদেশকে দিতে হয়। এই অতিরিক্ত টাকার স্বর্ণ প্রতি বৎসর তাহার দেশ হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবার কথা। কিন্তু এই সঙ্কটকাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, বিদেশে ইংরেজের যে বিপুল মূলধন ব্যবসায়ে খাটিত তাহার সুদ ও লাভ এবং পণ্যবাহী নৌবহর (mercantile marine) হইতে তাহার আয় এত অধিক ছিল যে তদ্দরুন বিদেশকে অতিরিক্ত আমদানীর জন্য কোন টাকা দেওয়ার প্রয়োজন হওয়া দূরের কথা, উপরন্তু প্রতি বৎসর ইংরেজই বিদেশ হইতে বহু টাকা পাইবার হকদার ছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ব্যবসা মন্দার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের এই সব আয় অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ অন্তে তাহাকে দেনদার হইতে হয়। ইংলণ্ডে স্বর্ণাভাবের ইহা অন্যতম কারণ, যদিও প্রধান কারণ নহে।

প্রধান কারণ খুঁজিতে হইলে আমাদিগকে ইউরোপীয় তৎকালীন কতকগুলি অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। লড়াইয়ের পর হৃতসর্ব্বস্ব জার্ম্মাণীর উপর পর্ব্বত-প্রমাণ ঋণভার চাপাইয়া দেওয়া হইল। ব্যবসা-বাণিজ্য, পণ্যবাহী নৌবাহিনী যাহার সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাহার বিদেশ হইতে আনীত মুখের অন্নের মূল্যটুকু পর্য্যন্ত দিবার শক্তি ছিল না, সে কোথা হইতে এত টাকা দিবে? কিন্তু ইহারা

বিষম জেদী জাত, তাই মরণ পণ করিয়া বৈদেশিক বাণিজ্য নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। কিন্তু তাহার জন্য বিপুল মূলধনের দরকার, মূলধন আসিবে কোথা হইতে? আমেরিকা ও ইংলণ্ড তাহাকে টাকা ধার দিতে রাজী হইল। ফলে জার্ম্মাণী অতি অল্প সময়ের ভিতর নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের আশ্চর্য্য-রকম উন্নতিসাধন করিয়া ফেলিল। কিন্তু ধার-করা টাকার সুদ আছে এবং সুযোগ বুঝিয়া ইহারা সুদও খুব উচ্চ হারে ধরিয়া লইয়াছিলেন। কাজেই বিরাট ঋণের বোঝা মাথায় করিয়া এত চেষ্টাতেও জার্ম্মাণী তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন বিশেষ করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে ১৯২৮-২৯ সালে আমেরিকা নিজের আভ্যন্তরীণ কতকগুলি কারণে জার্ম্মাণীকে আর টাকা ধার দিতে রাজী হইল না। ফলে জার্ম্মাণীর অবস্থা হইল সঙ্গীন। জার্ম্মাণীর ধ্বংসে ফ্রান্সের প্রভাব ইউরোপে অপ্রতিহত হইয়া পড়িবে এবং হয়ত ইউরোপে একটা বিপ্লবের সৃষ্টিও হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া ইংলণ্ড নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিল না এবং জার্ম্মাণীকে ঋণ-দান ব্যাপারে আমেরিকার শূন্য স্থান অধিকার করিল। অবশ্য ইহার পিছনে রাজনৈতিক কারণ ব্যতীত লাভের প্রত্যাশাও ছিল। ব্যবসায় মন্দা হেতু ইংরেজ ব্যাঙ্কারদের হাতে বহু টাকা জমিয়া যায়। আমেরিকা ও ফ্রান্সের ধনী সম্প্রদায়ের অনেক টাকাও এই-সব ব্যাঙ্কে সুদে খাটিত। ইংরেজ ব্যাঙ্কাররা তিন টাকা সুদে ইহাদের টাকা গচ্ছিত রাখিয়া আট টাকা সুদে ঐ টাকা জার্ম্মাণীকে ধার দিতে লাগিলেন। কিন্তু পৃথিবীর ব্যবসার অবস্থা নিম্নগামী হওয়ায় জার্ম্মাণী কিছুতেই আর তাল সামলাইতে পারিল না। তাহার অবস্থা যত বেশী সঙ্গীন হইতে লাগিল, নিজেদের পূর্ব্ব প্রদত্ত অর্থ বাঁচাইবার জন্য তাহাকে রক্ষা করা ইংরেজের তত

বেশী আবশ্যক হইয়া পড়িল। ফলে বাধ্য হইয়া আরও বেশী করিয়া টাকা ইংরেজ জার্ম্মাণীকে ধার দিতে লাগিল। এইরূপ ঋণদানের জন্য ইংরেজদের ভাবী অবস্থা সম্বন্ধে কতকটা আস্থাহীনতার দরুণও বটে, আবার নিজেদের দেশের অর্থসঙ্কট তখন গুরুতর হওয়ার দরুণও বটে, আমেরিকা ইংরেজদের ব্যাঙ্কে স্বল্প মেয়াদে গচ্ছিত টাকা ফেরত চাহিয়া বসিল। কিন্তু ইংরেজদের দেনদার জার্ম্মাণী, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ কেহই তাহাকে টাকা দিতে পারিল না। বাধ্য হইয়া ইংরেজকে তাহার নিজ রিজার্ভ তহবিল হইতে আমেরিকায় স্বর্ণ পাঠাইতে হইল। এইরূপে এত স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইতে লাগিল যে, সত্বর এই স্বর্ণ-রপ্তানী বন্ধ করিতে না পারিলে ইংরেজের স্বর্ণ-তহবিল শূন্য হওয়ার সম্ভাবনা হইয়া পড়িল। তখন আমেরিকা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া এই স্বর্ণ-রপ্তানী বন্ধ করিবার চেষ্টা করা হইল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমেরিকার মহাজনেরা ইংলণ্ড হইতে টাকা তুলিয়া লইতে ক্ষান্ত হইলেন না। ফলে আমেরিকা হইতে যে-টাকা ধার লওয়া হইল তাহাও শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া গেল। পুনরায় ঋণগ্রহণের চেষ্টা করিলে আমেরিকা এমন কতকগুলি অপমানসূচক সর্ত্ত করিয়া লইলেন যাহার ফলে ইংরেজ মন্ত্রীবর্গের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়া 'লেবার' গবর্ণমেণ্ট পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং রক্ষণশীল ও শ্রমিক দলের সংমিশ্রণে বর্ত্তমান ন্যাশানাল গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হয়। এই-সব গোলমালে ইংরেজদের প্রতি আমেরিকা ও ফ্রান্সের আস্থা আরও কমিয়া যায়। মাহিনা কমানো লইয়া ইংরেজ নৌ-সেনানীর মধ্যে একটা ক্ষুদ্র বিদ্রোহের সংবাদ ইতিমধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়ে এবং ফ্রান্স ও আমেরিকা উভয় দেশ তাহাদের প্রাপ্য টাকার জন্য অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়ে। তখন উপায়ান্তরহীন হইয়া ইংলণ্ডকে স্বর্ণমান

পরিহার করিতে হয়। এই সময়ে আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের স্বর্ণ-তহবিলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইংলণ্ডের অবস্থা কি পর্য্যন্ত কাহিল হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ১৯৩১ সালে আমেরিকার স্বর্ণ-তহবিলের পরিমাণ হইল ৪৬০০ মিলিয়ন ডলার; ফ্রান্সের ২৩০০ মিলিয়ন ডলার; ইংলণ্ডের ৬৫০ মিলিয়ন ডলার মাত্র।

স্বর্ণমান পরিহার করার ফলে বিদেশী মহাজনদের দেনা পরিশোধ করা ভিন্ন আর কাহাকেও সোনা দেওয়ার দায় হইতে ইংলণ্ড রক্ষা পাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী করিবার অধিকারও আইন-দ্বারা রহিত করা হইল। স্বর্ণহীন হইয়া এক পাউণ্ড কাগজের নোটের মূল্য কমিয়া গেল এবং যেখানে এক পাউণ্ড ষ্টার্লিং ৪·৮৬ ডলারের সমান ছিল, সেখানে তাহার মূল্য ন্যূনকল্পে ৩·৩০০ ও উর্দ্ধকল্পে ৪ ডলার মাত্র দাঁড়াইল। এই ব্যাপারে জগৎ সমক্ষে ইংলণ্ডের সম্মানের খুবই লাঘব হইল বটে, কিন্তু স্বর্ণমান পরিহার করার ফল তাহার পক্ষে শাপে বর হইয়া দাঁড়াইল। ষ্টার্লিংএর মূল্য হ্রাস পাওয়ায় বিলাতি মালের চাহিদা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া গেল। কারণ ষ্টার্লিংএর বিনিময়ে ফ্রান্স, আমেরিকা বা অন্যান্য দেশকে কম স্বর্ণমুদ্রা দিবার প্রয়োজন হইল। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ উচ্চহারে আমদানী শুল্ক বসাইয়া বিদেশী জিনিষের আমদানী বন্ধ করিবার যে চেষ্টা করিতেছিল ইংরেজ তাহা এইভাবে আংশিক ব্যর্থ করিয়া দিল। তাই ইংলণ্ড যখন সমর-ঋণের দায় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আমেরিকার নিকট অনুরোধ জানাইল, তখন মহাজন পক্ষ হইতে এমন একটা সর্ত্তের কথা উঠিয়াছিল যে, ইংলণ্ড যদি স্বর্ণমান পুনঃ গ্রহণ করে তবেই তাহাদের অনুরোধ সম্বন্ধে আমেরিকা বিবেচনা করিতে পারে। ইংলণ্ড এইরূপ সর্ত্তে অত্যন্ত আপত্তি করে। ফলে ওয়াশিংটন আলোচনায় মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ও

মিঃ রুজভেল্টের মধ্যে কোনরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে নাই ; অধিকন্তু মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে নিজগৃহে আদর-আপ্যায়নে পরিতোষ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকা স্বর্ণমান পরিহার ঘোষণা করিয়া ইংলণ্ডকে পাল্টা জবাব দিয়াছে। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, ১৯৩১ সালে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া বিনিময় হারের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও মন্দার বাজারে জিনিষের দর কমাইতে পারিয়া ইংলণ্ড কিছুটা সামলাইয়া লইতে পারিয়াছে। অবশ্য এ সুবিধা বেশী দিন থাকিবে না—যদি আমেরিকার ন্যায় ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশও স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে। *

এক্ষণে পৃথিবীর বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে আমরা এইরূপ একটা ধারণা মোটামুটি করিতে পারি—পৃথিবীতে কাঁচা ও তৈরী মাল অতিরিক্ত পরিমাণে সৃষ্টি হইতেছে ; অর্থের বা স্বর্ণের পরিমাণ ঐ মালের অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই ; আন্তর্জ্জাতিক ঋণের চাপে ও অন্যান্য কারণে স্বর্ণের ভাগ প্রত্যেক দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী না হওয়ায় পৃথিবীর অর্থের বা সোনার বাজারে একটা অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী বেশী হইয়া দেশের অর্থ যাহাতে বিদেশে চলিয়া না যায় তজ্জন্য বিদেশী মালের উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসাইয়া আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে বাধার সৃষ্টি করা হইতেছে ; অবস্থার চাপে পড়িয়া কতগুলি দেশ স্বর্ণমান পরিহার করিতে বাধ্য হওয়ায় এবং তাহার ফলে তাহাদের মাল বিদেশে স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ের সুবিধা হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি ও বিরোধ বৃদ্ধি পাইতেছে।

স্বর্ণমান পরিহারের অন্তর্নিহিত কারণ বিদূরিত করিয়া বিনিময়ের হার স্থির রাখিয়া general price level-এর উন্নতি সাধন করিতে পারিলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে ইহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু কি করিয়া তাহা সম্ভব এক্ষণে ইহাই প্রশ্ন বা সমস্যা।

সকলেই ব্যক্তিগত স্বার্থ দেখিলে যেমন কোন জাতির সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষা হইতে পারে না, সেইরূপ প্রত্যেক জাতিই যদি নিজ নিজ 'পাউণ্ড অব ফ্লেশ' দাবি করে, তাহা হইলে পরস্পরসংশ্লিষ্ট এই আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার মীমাংসা হওয়া সুদূরপরাহত। দেশসমূহের মনোবৃত্তি যদি বিশ্বাস ও সাহসের সহিত জাতীয়তার ও বিশ্বমানবতার সমন্বয় করিতে না পারে, তাহা হইলে মীমাংসা অসম্ভব এবং সম্মুখে বিপ্লব ও নূতন সৃষ্টি এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী।

স্বর্ণমান যতদিন থাকিবে ততদিন নোটের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ দিবার সর্ত্তও থাকিবে এবং আইন করিয়া স্বর্ণের অতিরিক্ত নোটের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিতে হইবে ; দুনিয়ার পণ্য বাড়িয়া চলিলেও দর চড়া রাখিবার জন্য ইচ্ছামত নোট প্রচলন করা যাইবে না। সেইজন্য প্রশ্ন উঠিয়াছে দুনিয়ার স্বর্ণ-তহবিল অনুযায়ী অর্থের প্রয়োজন নির্দ্ধারিত না করিয়া দুনিয়ার পণ্যের পরিমাণ অনুসারে অর্থ প্রচলন করা সম্ভব কি-না। তাহা হইলে অর্থের পরিমাণ বাড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের মূল্যও চড়িয়া যাইবে এবং সেই মূল্যের এত ঘন ঘন পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু তাহা করিতে হইলে দেশ-বিশেষের চেষ্টায় উহা সম্ভব হইতে পারে না। সকল জাতি মিলিয়া যদি একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে পারে এবং সেই ব্যাঙ্ক যদি সকল জাতির সম্মতি অনুসারে পৃথিবীর পণ্যের পরিমাণ বুঝিয়া মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে তবেই ইহা সম্ভব। ইহাতে

* কার্য্যতঃ ফ্রান্স, ইটালী ও মধ্য ইউরোপের ক্ষুদ্র কএকটি দেশ ব্যতীত অধিকাংশ দেশই স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছে। এবং স্বর্ণমান বজায় রাখিতে যাইয়া ফ্রান্সের অবস্থাও কাহিল হইয়া উঠিয়াছে। কোন গভর্ণমেণ্টই স্থায়ী হইতে না পারার দরুণ ফ্রান্সে বর্ত্তমানে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহার জন্য এই স্বর্ণমান-নীতিও বিশেষভাবে দায়ী।

স্বর্ণমান একেবারে পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইবে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশ অনুযায়ী স্বর্ণের অনুপাতে প্রত্যেক দেশের নোট প্রচলন করিবার ক্ষমতা আরও কিছু বাড়াইয়া দিতে হইবে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে হিসাব-নিকাশ হইয়া যে দেনা দাঁড়াইবে শুধু তাহা স্বর্ণদ্বারা পরিশোধ করিলেই চলিবে। এমনও কেহ কেহ বলেন, দেনা স্বর্ণ-দ্বারা পরিশোধ না করিয়া জিনিষের দ্বারা পরিশোধ করিবার অধিকার দিতে হইবে। আবার এরূপ মতও কেহ কেহ পোষণ করেন যে, পৃথিবীর সকল দেশের স্বর্ণ-তহবিল আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের (League of Nations এর) কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জিম্মায় থাকিবে এবং সেখানে প্রত্যেক দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী লেন-দেন হইয়া হিসাবে জমা-খরচ হইবে। কিন্তু এই পন্থা কার্য্যকরী করিতে হইলে প্রত্যেক দেশের স্বাতন্ত্র্য ওস্বেচ্ছানুবর্ত্তিতাকে অনেকখানি লোপ করিয়া দিতে হইবে। বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য তাহার একান্ত আবশ্যকতা থাকিলেও সেই মনোভাবেরনিতান্তই অভাব দেখা যাইতেছে। অথচ এত আলোচনা এবং চিন্তার পরও অন্য কোন পন্থা নির্দ্দেশ আজ পর্য্যন্তও হইল না।

ভারতে মুদ্রানীতি

কোন দেশের আর্থিক উন্নতির সহিত সেই দেশের মুদ্রাসম্পর্কীয় নীতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, এ কথা ভুলিলে আমাদের বর্ত্তমান যুগে চলিবে না। অথচ ইহা বলা বোধ হয় মোটেই অত্যুক্তি হইবে না যে, এ সম্পর্কে আমাদের অত্যন্ত জ্ঞানাভাব। আমাদের বিদ্বজ্জন-সমাজে আজও এমন লোকের অসদ্ভাব নাই যাঁহারা মনে করেন এবং অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিয়াও থাকেন, "গভর্ণমেণ্টের আর ভাবনা কি, টাকা তৈরি করিবার জন্য টাকশাল রহিয়াছে, যখন যত খুসী টাকা ও নোট প্রস্তুত করিয়া লইলেই হইল।" রহস্য এই যে, শ্রোতাদের মধ্যেও এ-সব বিষয়ে অনেকের ধারণা অনেকটা পরকালতত্ত্বের ন্যায়ই অস্পষ্ট হওয়ায়, তাঁহাদের পক্ষেও নীরব গাম্ভীর্য্যের সহিত এ-সব বিজ্ঞজনোচিত উক্তি মানিয়া লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু বিষয়টী মোটেই হাস্যরসাত্মক নহে, পরন্তু ইহা যেমনি জটিল তেমনি আমাদের পক্ষে মারাত্মক; কারণ আমাদের ব্যবসাবাণিজ্য, অন্নবস্ত্র—এক কথায়, আমাদের জীবন-মরণের অনেকখানি ইহার হাতে। বৃটিশ-শাসনে "শান্তি ও শৃঙ্খলা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; আমাদের ধনরত্ন চোর-ডাকাত-ঠগের হাত হইতে অনেকটা নিরাপদ হইয়াছে; সিপাই-শান্ত্রী, আইন-আদালত, জজ-কঁউসিলি সকলে মিলিয়া ধর্ম্মরাজের চতুর্দ্দোল সগৌরবে বহন করিতেছে—এ সবই সত্য এবং এ-সব কথা আজকাল আমাদের স্কুলের ছোট ছোট বালকেরাও জানে। কিন্তু যাহা আজিকার দিনে আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে ও শিখিতে হইবে তাহা হইতেছে

এই যে, বর্ত্তমান যুগে শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যেও নিপুণ অদৃশ্য হস্তে পরস্বা-পহরণ চলিয়াছে এবং এক জাতি অপর জাতির দৌলতে ফাঁপিয়া উঠিতেছে। ইহারই নাম scientific exploitation বা বৈজ্ঞানিক পন্থায় ধনমোক্ষণ। এইরূপ নীরব প্রক্রিয়ার ফল শত শত নাদির শার লুণ্ঠন অপেক্ষাও অনেক দুর্ব্বল জাতির পক্ষে ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অর্থশাস্ত্রেরই একটি বড় অধ্যায়—ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

মুদ্রা মানুষের দেনা-পাওনা মিটান সম্পর্কে মধ্যস্থ হইয়া কার্য্য করে এবং এই ভাবে বিভিন্ন মানুষ ও দেশের মধ্যে পণ্য-বিনিময়ের সুবিধা করিয়া দেয়। ইহা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে জামিন-স্বরূপ দাঁড়াইয়া বিক্রেতাকে বলিতে থাকে, "তুমি তোমার পণ্যের বিনিময়ে অন্য কোন পণ্য দাবী করিও না, তাহার পরিবর্ত্তে আমাকে গ্রহণ কর, আমি তোমার সকল প্রয়োজন মিটাইব।" এইরূপ ব্যাপক যাহার প্রয়োজনীয়তা তাহা এমন একটা বস্তু হওয়া আবশ্যক যাহা আকারে বা পরিমাণে বিস্তৃত হইবে না এবং যাহাকে রক্ষা করিতে বা হস্তান্তর করিতে অসুবিধা হইবে না। অধিকন্তু তাহা টেকসই হইবে এবং জগতে তাহার নিজের একটা প্রয়োজনীয়তা বা মূল্য থাকিবে। এই কারণে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি ধাতু মুদ্রা-জগতে একাধিপত্য করিয়া কৌলীন্য লাভ করিয়াছে। কোন দেশের গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া ধনী হইতে পারেন না; কারণ তাহাকে স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি ধাতু বাজার হইতে মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইবে এবং সাধারণ নিয়মানুযায়ী ধাতুর যাহা মূল্য তাহাই মুদ্রার মূল্য-স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এখানে কাগজের তৈরী নোটের কথা উঠিতে পারে। তাহার উত্তর এই যে, কাজকর্ম্মের সুবিধার জন্য সকল দেশের গভর্ণমেণ্ট নোটের

প্রচলন করিলেও নোটের বিনিময়ে টাকা বা মুদ্রা দিবার আইনসঙ্গত দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বদাই রহিয়াছে এবং তদ্দরুণ তাহাকে স্বর্ণ বা রৌপ্য তহবিল পৃথক করিয়া রাখিতে হয়। কোন গভর্ণমেণ্ট যখন নোটের বিনিময়ে স্বর্ণ বা রৌপ্য দিতে অসমর্থ হন (যেমন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সম্প্রতি ঘটিয়াছে) তখন সেই গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা কোন বিশেষ কারণে সঙ্কটাপন্ন এবং এই ব্যবস্থা সাময়িক বুঝিতে হইবে।

গভর্ণমেণ্টের ন্যায় সরকারী টাকশালে স্বর্ণ বা রৌপ্য জমা দিয়া নিখরচায় মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া লইবার অধিকার সকল সভ্য দেশের প্রজাবর্গেরও সাধারণ অবস্থায় রহিয়াছে। এই অধিকার হইতে আমরা ভারতবাসী ১৮৯৩ সালের আইনদ্বারা বঞ্চিত হইয়াছি এবং সম্ভবতঃ তাহারই ফলে উল্লিখিত ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। সমর-ঋণ, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি কর্ম্মদ্বারা পাশ্চাত্য দেশসমূহ আত্মকৃত ব্যাধির সৃষ্টি করিয়া সঙ্কটকালে যে সকল বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে, সেই সকল বর্ত্তমান আলোচনায় ধর্ত্তব্য নহে। সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থনীতির যে-সকল হিতকর মূলসূত্র সভ্যদেশে অনুসৃত হয়, সেই সব সূত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ভারতের অবস্থা বিচার করিতে হইবে। উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা এইরূপ দুইটী সাধারণ নীতি বা সূত্রের পরিচয় পাইয়াছি—(১) প্রত্যেক দেশের প্রধান মুদ্রার বাহিরের নির্দ্দিষ্ট মূল্যের সহিত তাহার অন্তর্গত ধাতুর মূল্যের কোন প্রভেদ থাকিবে না; (২) সর্ব্বসাধারণের সরকারী টাকশাল হইতে টাকা প্রস্তুত করিয়া লইবার অবাধ অধিকার থাকিবে। দুর্ভাগ্য-বশতঃ ভারতে ইহার কোনটাই বিদ্যমান নাই। অর্থশাস্ত্রে যাহাকে

অন্ত্যজ বা হীন মুদ্রা (base or token coin) বলে, ভারতের রৌপ্যমুদ্রা সেই শ্রেণীর। ইহার ধাতুর মূল্য অপেক্ষা গভর্ণমেণ্ট-নির্দ্ধারিত মূল্য প্রায় দ্বিগুণ। বিশ্বের আর কোন উন্নতিশীল জাতির প্রধান মুদ্রার এরূপ হীন অবস্থা আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। প্রথম নীতির ব্যতিক্রম ঘটিলে দ্বিতীয় নীতিকেও পরিহার করা ভিন্ন উপায় থাকে না। অন্যথা স্বল্প মূল্যের ধাতুদ্বারা অধিক মূল্যের মুদ্রা লাভ করিয়া রাতারাতি ধনী হইবার সহজ কল্পনায় সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিবে!

অবাধ বাণিজ্য ও বিভিন্ন দেশের দেনা-পাওনা সহজে নিষ্পত্তি করিবার জন্য আর্থিক ব্যবস্থা যথাসম্ভব সহজ ও সরল হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক দেশের মুদ্রা যদি পূর্ণ মূল্যের স্বর্ণ বা রৌপ্য ধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দায় মিটাইবার জন্য মুদ্রার অপ্রতুল হইলে প্রয়োজন অনুযায়ী যদি সরকারী টাকশাল হইতে উহা প্রস্তুত করিয়া লওয়া বিধিমত সম্ভব হয়, তাহা হইলে অন্তর ও বহির্বাণিজ্যের দেনা-পাওনা মিটান সম্পর্কে অনেক সমস্যার হাত হইতে আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি। এমন কি যুদ্ধবিগ্রহ আদি গুরুতর ও অস্বাভাবিক অবস্থার ফলে আন্তর্জ্জাতিক দেনা পাওনার তুলাদণ্ড একদিকে অতিরিক্ত ভারী হইয়া অধিকাংশ স্বর্ণ বা রৌপ্য এক দেশ হইতে অপর দেশে উধাও হইবার সম্ভাবনা না ঘটিলে (সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে যাহা ঘটিয়াছিল) ইহা অপেক্ষা সুব্যবস্থা মুদ্রাব্যাপারে আর কিছু হইতে পারে না। বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া বলিবার চেষ্টা করা যাক্। যদি দুইটি পরস্পর-সংশ্লিষ্ট দেশের প্রধান মুদ্রায় কোনরূপ ঘাটতি না থাকে, অর্থাৎ যদি উহাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ মূল্য একই হয় এবং দুইটি দেশই যদি স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে মুদ্রানীতির মারপ্যাচে কোন পক্ষের

ঠকিবার কোনরূপ সম্ভাবনা থাকে না এবং তাহাদের মধ্যে দেনা পাওনা স্থির করা বা মিটানও সহজ হইয়া দাঁড়ায়। আমেরিকার ডলার, ইংলণ্ডের ষ্টার্লীং ও ফ্রান্সের ফ্রাঁ মুদ্রার কোনটিতে কি পরিমাণ স্বর্ণ আছে, আমরা জানি। সুতরাং জোগান ও চাহিদার সাধারণ নিয়মানুসারে অন্যান্য জিনিষের ন্যায় স্বর্ণের বাজার-দর কম-বেশী হইলেও তিনটি দেশের স্বর্ণমুদ্রার আপেক্ষিক মূল্য ঠিকই থাকিবে এবং দেনা-পাওনা মিটাইতে গিয়া কাহাকেও বিনিময়ের হেরফেরে পড়িয়া ঠকিতে হইবে না। রৌপ্যমুদ্রাবিশিষ্ট দেশসমূহের সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। যদি এক দেশে স্বর্ণমুদ্রার ও অপর দেশে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন থাকে, তাহা হইলেই উহাদের মধ্যে হিসাব-নিকাশের সময় কিছু গোল হইবার সম্ভাবনা। কারণ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ের হার কোনও ধাতুর সাময়িক আধিক্য বা অল্পতা হেতু কখনও কখনও কম বা বেশী হইতে পারে এবং তাহার ফলে পরস্পরের মধ্যে দেনা-পাওনার পরিমাণ নড়চড় হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ঘটে। কোন ভারতীয় ব্যবসায়ী ১৫,০০০ পাউণ্ড ষ্টার্লিং মূল্যের বিলাতী কাপড়ের 'অর্ডার" দিবার সময় যদি বিনিময়ের হার প্রতি টাকায় ১ শিলিং ৬ পেনি হয়, তাহা হইলে তাহাকে মূল্য বাবদ ২,০০,০০০ টাকা দিলেই চলিবে। কিন্তু তাহার পরেই যদি রূপার দর পড়িয়া গিয়া বাট্টার হার ১ শিলিং ৪ পেনি দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাহাকে ঐ জিনিষের জন্য ২,২৫,০০০ টাকা মূল্য দিতে হইবে। কেবল বাট্টার দরুণ তাহাকে এ ক্ষেত্রে ২৫,০০০ টাকা বেশী দিতে হইতেছে! ঠিক তেমনি যদি কোন ইংরেজ বণিক আমাদের দেশে বাট্টার হার ১ শিলিং ৬ পেনি থাকা কালীন ২,০০,০০০ টাকার পাটের অর্ডার দেয়, আর মূল্য দিবার সময় বাট্টার হার ১ শিলিং ৪ পেনি হয়, তাহা হইলে তাহাকে ১৫,০০০

পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে মাত্র ১৩,৩৩৩ পাউণ্ড ৬ শিলিং ৮ পেনি দিলেই চলিবে। দুই দেশের মুদ্রা যদি দুই ভিন্ন ধাতুর হয়, তাহা হইলে মূল্যের এইরূপ তারতম্য এবং তদ্দরুণ একের লাভ ও অপরের ক্ষতি সময় সময় অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহাও অনেকটা নিবারণ করিতে পারা যায় যদি সরকারী টাকশাল হইতে মুদ্রা তৈরী করিয়া লইবার অবাধ অধিকার জনসাধারণের থাকে। কি ভাবে তাহা বলিতেছি। বিনিময়ের হার কমিলেই কেমন করিয়া আমদানী মালের দর বৃদ্ধি এবং রপ্তানী মালের দর হ্রাস পায় তাহা উপরের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা দেখিয়াছি। ইহার ফলে বিদেশী পণ্যের আমদানী কমিতে থাকে ও দেশী পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি পায়। আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী হইলেই তাহার মূল্য দিবার জন্য অধিকতর টাকার আবশ্যক হয় এবং তজ্জন্য অধিকতর রৌপ্যেরও প্রয়োজন হয়। ফলে রৌপ্যের মূল্যের পুনঃবৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা ঘটে এবং বিনিময়ের হার পূর্ব্বাবস্থা বা সমতা (parity) লাভ করিবার চেষ্টা করে। আমাদের লেন-দেন প্রধানতঃ ইংলণ্ডের সহিত। তারপর আর যে-সকল দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্যাদির দরুণ আর্থিক সম্পর্ক তাহাদেরও অধিকাংশ স্বর্ণমানবিশিষ্ট। ভারতে রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্ত্তে স্বর্ণের প্রচলন হইলে বিনিময়ের কবলে পড়িয়া আমাদিগকে এভাবে ভুগিতে হইত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা অর্থশাস্ত্রের সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মগুলি হইতে বিচ্যুত হইয়া কেবলই সমস্যার পর সমস্যায় পতিত হইতেছি এবং শতছিদ্র-বিশিষ্ট মৃৎপাত্রে বারিধারণের ব্যর্থ প্রয়াসের ন্যায় আমাদের মুদ্রা-সমস্যা-সমাধানের সকল চেষ্টা প্রতিহত হইতেছে। সেই ব্যর্থ চেষ্টার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এক্ষণে আলোচনা করিব।

দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-প্রাধান্য চিরদিনঅক্ষুণ্ণ থাকায় সহস্রাধিক

বৎসর যাবৎ স্বর্ণমুদ্রাই এতদঞ্চলে একাধিপত্য করিয়া আসিতেছিল। উত্তর ভারতে মুসলমান রাজত্বকালে স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বিবিধ মুদ্রারই প্রচলন ছিল; কিন্তু বাদশাহগণ রৌপ্যমুদ্রাকেই অধিকতর প্রাধান্য দিতেন। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ের হার নির্দ্দিষ্ট করা ছিল না—মুদ্রামধ্যস্থিত ধাতুর মূল্য অনুযায়ী হার স্থির করা হইত। এদিকে ধাতুর মূল্য পরিবর্ত্তনশীল; ইহাতে কাজকর্ম্মের অসুবিধা হয় দেখিয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহাদের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট বাট্টার হার বাঁধিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ধাতুর বাজার-দর স্থির না থাকায় নির্দ্দিষ্ট হারে দ্বিবিধ মুদ্রার (Bimetalism-এর) প্রচলন অসম্ভব হয় এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে আইন-প্রণয়ন দ্বারা সমগ্র ভারতের জন্য এক তোলা ওজনের রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন বিধিবদ্ধ করা হয়। দেনা পরিশোধের জন্য স্বর্ণমুদ্রা লইতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আর বাধ্য রহিলেন না। এইরূপে দ্বৈত মুদ্রার পরিবর্ত্তে ভারতে এক রকম মুদ্রার (monometalism-এর) প্রচলন হয়। কেন যে স্বর্ণের পরিবর্ত্তে রৌপ্যের উপর কর্ত্তৃপক্ষের সুনজর পতিত হইল তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। একটা কারণ এই বলা হয় যে, ভারতবাসীরা স্বর্ণ বড় ভালবাসে, স্বর্ণমুদ্রা পাইলেই তাহা সিন্দুকে পুরিবে, নয়ত বাঁশের চোঙ্গায় বা ঘড়ায় করিয়া মাটিতে পুতিবে এবং এইভাবে অল্প সময় মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা অদৃশ্য হইয়া কাজ অচল হইবে। ইহার মূলে যেটুকু সত্য আছে তার জন্য আমাদের যাহারা দোষারোপ করেন তাহারাই যে দায়ী এবং এই অজুহাতে ভারতবাসীকে স্বর্ণমান হইতে বঞ্চিত রাখা যে যুক্তি বা ন্যায়সঙ্গত নহে তাহা চেম্বারলেন কমিশনের বিখ্যাত সদস্য স্যার জেম্‌স্ বেগ্‌বি সাহেবের নিম্নলিখিত অভিমত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে :—

"যে নীতি ভারতে হীনমুদ্রার প্রবর্ত্তন করিয়াছে, সেই নীতিই ভারতবাসীর এইরূপ গোপন সঞ্চয়ের অভ্যাসের জন্য বহুল অংশে দায়ী। ভারতীয় টাকশাল হইতে রৌপ্য-বিনিময়ে পূর্ণ মূল্যের মুদ্রা পাইবার অধিকার ১৮৯৩ সালে রহিত হইয়া যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের জনসাধারণ পুরুষানুক্রমে পূর্ণ মূল্যের মুদ্রা ব্যবহারে অভ্যস্থ ছিল। তাই আজ আর তাহারা তাহাদের লাভ ও সঞ্চয় ফাঁপান মূল্যের হীন টাকার আকারে রাখিতে প্রস্তুত নহে।"* এ'কথার মধ্যে যে অনেকখানি সত্য রহিয়াছে তাহা প্রমাণের আবশ্যক করে না। তবে ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশ স্বর্ণমান গ্রহণ করিলে স্বর্ণের চাহিদা হঠাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া পাশ্চাত্য দেশ সমূহের মুদ্রাব্যবস্থা মধ্যে একটা বিপ্লব আনয়ন করিবে এই আশঙ্কা আমাদের ভাগ্য নির্দ্ধারণে অনেকাংশে দায়ী ইহাতে সম্ভবতঃ সন্দেহ নাই। যাহা হউক, স্বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া রৌপ্য গ্রহণই ভারতের ভাগ্যে কাল হইল—কেমন করিয়া তাহা পরে বলিতেছি।

১৮৩৫ সালের আইন দ্বারা স্বর্ণমুদ্রা রদ করা হইলেও জনসাধারণ তাহাদের কাজকর্ম্মের জন্য স্বর্ণমুদ্রা দাবি করিতে লাগিল। ফলে

* "The hoarding habit is to a large extent the outcome of the policy which has brought into existence token currency. Up to the closing of the mints in 1893 to the free coinage of silver, the public had been accustomed for generations to full value coins for their currency requirements and they are not now prepared to hold their profits and savings in the form of over-valued rupees."

১৮৪১ সালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরকারী রাজকোষে স্বর্ণমোহর গ্রহণ করিবার আদেশ প্রচার করিতে বাধ্য হইলেন। মোহরে ও টাকায় একই ওজনের (এক তোলা) সোনা ও রূপা ছিল এবং কয়েক শতাব্দী যাবৎ সোনার দর রূপা হইতে প্রায় পনর-গুণ বেশী চলিয়া আসিতেছিল; সেই কারণেই এক মোহরের মূল্য পনর টাকা বলিয়াই জনসাধারণ এতকাল জানিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে ক্যালিফোর্ণিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ায় বিস্তৃত স্বর্ণখনি আবিষ্কারের ফলে সোনার দাম কমিতে সুরু করিল এবং জনসাধারণ ১ মোহর = ১৫ টাকা, এই পুরাতন হার অনুযায়ী কোম্পানীর দেনা সোনায় মিটাইয়া লাভবান হইতে লাগিল।

সরকারের নিকট যাহার ত্রিশ টাকা দেনা ছিল তিনি দুই মোহর দিয়া রেহাই পাইলেন; অথচ সোনার দর পড়িয়া যাওয়ায় বাজারে ২ মোহরের মূল্য তখন হয়ত ২৮ টাকার বেশী নয়। ইহাতে গভর্ণমেণ্টের গুরুতর ক্ষতি হইতে লাগিল এবং ১৮৫২ সালে গভর্ণমেণ্ট নোটিফিকেশন দ্বারা রাজকোষে মোহর গ্রহণ পুনরায় রহিত করিয়া দিলেন। কিন্তু দেশে স্বর্ণমান প্রচলনের জন্য তীব্র আন্দোলন সুরু হইল। প্রত্যেক রাজস্বসচিব ভারতের প্রকৃত মঙ্গল উপেক্ষা করিতে না পারিয়া স্বর্ণমানের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিলেন; এমন কি ১৮৬৪ সালে একটি স্কিমও তখনকার রাজস্বসচিব খাড়া করিলেন। কিন্তু এত আন্দোলন সত্ত্বেও ভারত-সচিবের অনুগ্রহ না হওয়ায় আমাদিগকে দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে হইল। ভারতবাসীরা প্রকৃতই স্বর্ণমুদ্রা চাহে কি-না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার টাকশালে প্রস্তুত স্বর্ণমুদ্রা মাত্র ভারত-গভর্ণমেণ্ট তাহাদের পাওনার পরিবর্ত্তে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এইরূপ জোড়াতাড়া দেওয়া

নীতিতে কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না এবং দেশীয় টাকশালে প্রস্তুত পূর্ব্বাদস্তুর স্বর্ণমানের জন্য আন্দোলন বাড়িয়াই চলিল। ফলে যেমন সর্ব্বদা আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে—একটি রয়্যাল কমিশন আমাদের দাবি পরীক্ষার জন্য বসিল। তাঁহারাও জনমতের আন্তরিকতা ও যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার অনুকূলেই মত প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু পরিণামে কিছুই হইল না।

১৮৭১ সালে জার্ম্মাণী রৌপ্যমান পরিহার করিয়া স্বর্ণমান গ্রহণ করে। ডেনমার্ক, হলাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশও জার্ম্মাণীর পদাঙ্কানুসরণ করে। ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ইটালী প্রভৃতি যে-সকল দেশে দ্বৈত মুদ্রার প্রচলন ছিল তাহারাও উভয় মুদ্রার বিনিময়ের হার ঠিক রাখিতে অসমর্থ হইয়া রৌপ্যমুদ্রার অবাধ তৈরি বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে রূপার চাহিদা হঠাৎ অত্যন্ত হ্রাস পাইয়া তাহার মূল্য খুব কমিয়া যায়। এই সঙ্কট সময়ে ভারতবর্ষেও স্বর্ণমান প্রচলনের জন্য বিখ্যাত রাজস্বসচিব স্যার রিচার্ড টেম্প্‌ল আর একবার বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৮৭৪ সালের মে মাসে—তাঁহার পদত্যাগের একমাস পরেই, ভারত-গভর্ণমেণ্ট কোন কারণ প্রদর্শন না করিয়াই তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পরিণাম ভারতের পক্ষে অত্যন্ত খারাপ হইয়া দাঁড়ায়। ১৮৭২ সাল ও ১৮৯৩ সালের মধ্যে প্রতি টাকার মূল্য ২ শিলিং হইতে ১ শিলিং ৩ পেনিতে নামিয়া আসে। ফলে সস্তা রূপা খুব অধিক পরিমাণে ভারতবর্ষে আমদানী হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহা মুদ্রায় পরিণত হইয়া বাজারে ছড়াইয়া পড়ে। প্রয়োজন-অতিরিক্ত মুদ্রা বাজারে চলিতে থাকায় অর্থনীতির যোগান ও চাহিদার সাধারণ নিয়মানুসারে ভারতে জিনিষের দর চড়িয়া যায়। পক্ষান্তরে ইউরোপে সোনার দর রূপার তুলনায় চড়া থাকায় সেখানকার

জিনিষের দর কমিতে থাকে। সেই কারণে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা বিশ্বের হাটে কমিয়া গিয়া বিদেশী জিনিষের চাহিদা ভারতের হাটে অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং ইহাতে ভারতের গুরুতর অর্থহানি ঘটিতে সুরু করে। ভারত-সরকারের ক্ষতির পরিমাণও প্রতি বৎসর বাড়িয়া চলিতে থাকে। ভারত-সরকারকে প্রতি বৎসর প্রায় ৩॥ কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং "হোম চার্জ্জেস' দরুণ বিলাতে পাঠাইতে হয়। ইংরেজ আমলাতন্ত্রের ও গোরা সৈন্যবাহিনীর মাহিনা, ভাতা, পেন্সন, ভারতীয় রেল ও পূর্ত্ত বিভাগের জন্য ধার করা টাকার সুদ, বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিস ও হাই কমিশনার অফিসের খরচাদি বাবদ এই টাকা আমাদিগকে দিতে হয়। ইহা ভারতের পক্ষে নিচক ক্ষতি কিংবা ইহার বিনিময়ে আমরা যাহা পাই তদ্দ্বারা আমাদের ক্ষতিপূরণ হয়, সে-বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। যাহারা টাকা দেন তাঁহাদের এক মত এবং যাঁহারা টাকাটা পান তাঁহাদের অবশ্য অন্য মত। যাহা হউক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিরাট ও বিরোধী বিষয় লইয়া আলোচনার প্রয়োজন নাই। মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক। টাকার দর ২ শিলিং থাকাকালীন 'হোম চার্জ্জেস' দরুণ প্রায় ৩॥ কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং পরিশোধ করিতে আমাদিগকে যত টাকা দিতে হইত, টাকার দর যখন ১ শিলিং ৩ বা ৪ পেনিতে নামিয়া আসিল, তখন আমাদিগকে তদপেক্ষা একেবারে এক-তৃতীয়াংশ বেশী দিতে হইল। অর্থাৎ কেবল বাট্টার হেরফেরের জন্য আমাদের দেনা ১ কোটি ১৭ লক্ষ পাউণ্ড (অর্থাৎ ১৭ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা) প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইয়া গেল! শুধু তাহাই নহে, বাট্টা বা বিনিময়ের হারের এরূপ অনিশ্চয়তার দরুণ বিদেশের সহিত বাণিজ্য করা কঠিন হইয়া উঠিল; কারণ কাহারও পক্ষে লাভ ক্ষতির পরিমাণ স্থির করিয়া কার্য্য করা আর সম্ভব রহিল

না। বিনিময়ের হার নামিয়া যাওয়ায় আমাদিগকে যে অতিরিক্ত টাকা দিতে হইল তাহাও আমাদিগকে পণ্য বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিতে হইল এবং তাহার মূল্যও বাট্টার জন্যই আমরা আবার কম করিয়া পাইলাম। টাকার মূল্য হ্রাস পাওয়ায় ভারত সরকার তাহার তহবিলের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য লবণ-কর ইত্যাদি বৃদ্ধি করিলেন। ফলে যাহারা পূর্ব্বেই একবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহাদেরই উপর পুনরায় জুলুম হইল। ভগবান যে বিপুল নৈসর্গিক ঐশ্বর্য্য ভারতকে দান করিয়াছেন, সেই ঐশ্বর্য্য আহরণ করিতে হইলে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। অর্থের প্রধান হাট লণ্ডন। সেখানে সমস্ত কারবার স্বর্ণের মারফতে হয়; ভারতবর্ষের কারবার রৌপ্যে; আবার তাহারও মূল্যের স্থিরতা নাই। কাজেই বাট্টার গোলমালে বিদেশীয় অর্থ ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য-বিস্তারের সহায়তার জন্য তেমন আসিতে পারিল না। এক হিসাবে ইহাও আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হইল।

এই সব কারণে ১৮৭৮ সাল হইতে ১৮৯২ সাল পর্য্যন্ত স্বর্ণমান প্রচলন ও রৌপ্যমুদ্রার অবাধ নির্ম্মাণ স্থগিত রাখিবার জন্য দেশের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-সঙ্ঘ প্রভৃতি হইতে জোর আন্দোলন চলিতে থাকে। ১৮৭৮ সালে ভারত সরকার স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি স্কিম পেশ করিলেন বটে, কিন্তু ভারতসচিব তাহা নাকচ করিয়া দিলেন। এই দিকে ১৮৬৭ সাল ও ১৮৯২ সালের মধ্যে যে চারিটি আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বৈঠক বসে, ভারত সরকার তাহার সহযোগিতায় বিনিময়ের হার নির্দ্দিষ্ট করা যায় কি-না সেই চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। সেই দিকেও নিরাশ হইয়া ১৮৯২ সালে ভারত-গভর্ণমেণ্ট পুনরায় ভারতসচিবের নিকট নিম্নলিখিতরূপ একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেন—(১) স্বর্ণমান প্রচলন উদ্দেশ্যে সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক টাকশাল হইতে

রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তত রহিত করিয়া দেওয়া হউক; (২) তদ্বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুতের অবাধ অধিকার সর্ব্বসাধারণকে দেওয়া হউক; (৩) স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক বৎসরের গড় হার পরীক্ষা করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে বিনিময়ের হার নির্দ্ধারণ করা হউক; (৪) বিলাতের মুদ্রাকে দেশীয় মুদ্রার ন্যায় এদেশে চলিতে দেওয়া হউক এবং রৌপ্যমুদ্রার সহিত ইহার বিনিময়ের হার ১ শিলিং ৬ পেনি নির্দ্দিষ্ট করা হউক। ভারতসচিবের নির্দ্দেশ মত হার্সেল কমিটি এই প্রস্তাব পরীক্ষা করেন। তাঁহাদের নির্দ্ধারণ অনুযায়ী ১৮৯৩ সালে যে মুদ্রা-আইন বিধিবদ্ধ হয় তাহার ফলে ভারতীয় টাকশালে সাধারণ কর্ত্তৃক রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল কিন্তু অবাধ স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের কোন ব্যবস্থা করা হইল না। ভারতীয় রাজকোষ হইতে টাকা দিয়া গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণ হইতে স্বর্ণথান ও স্বর্ণমুদ্রা ১ শিলিং ৪ পেনি হারে (১ শিলিং ৬ পেনি নহে) গ্রহণ করিবেন ইহাই মাত্র স্থির হইল। এই ব্যবস্থার একটি প্রধান দোষ এই থাকিয়া গেল যে গভর্ণমেণ্ট স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণথানের পরিবর্ত্তে টাকা দিতে বাধ্য থাকিলেও টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ দিবার কোন বাধ্যবাধকতা তাঁহাদের রহিল না। এই অবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা ও হীন রৌপ্যমুদ্রার মধ্যে গভর্ণমেণ্ট-নির্দ্ধারিত ১ শিলিং ৪ পেনি হার স্থির রাখা সম্ভব হইতে পারে না। কারণ বাট্টার হার বাঁধিয়া দেওয়া হইল কিন্তু বাজারের দুইটি ধাতু বা মুদ্রার পরিমাণ স্বাভাবিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইবার পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

১৮৯৩ সালের পরেও রূপার দর কমিয়াই চলিল এবং বিনিময়ের হার ১ শিলিং ১$\frac{1}{2}$ পেনি পর্য্যন্ত নামিল। ১৮৯৮ সালে ভারত-গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় একটি প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন।

তাহার ফলে ফাউলার কমিটি নামে যে কমিটির নিয়োগ হইল তাঁহারা ভারত-গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের অনুকূলে মত প্রকাশ না করিলেও পূর্ণ স্বর্ণমান প্রচলনের পক্ষেই মত নির্দ্ধারণ করিলেন। তাঁহাদের প্রস্তাবের তাৎপর্য্য এইরূপ—(১) বিলাতের স্বর্ণমুদ্রা (সভারিন) ভারতে অবাধে চলিতে পারিবে; (২) ভারতীয় টাকশালে অবাধে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হইতে পারিবে; (৩) স্বর্ণ অবাধে আমদানী ও রপ্তানী হইতে পারিবে (ইহা পূর্ণ স্বর্ণমানের একটী প্রধান লক্ষণ); (৪) গভর্ণমেণ্ট স্বর্ণের বিনিময়ে টাকা দিবেন বটে কিন্তু নূতন টাকা আর প্রস্তুত করিতে পারিবেন না, যে পর্য্যন্ত না সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্বর্ণমুদ্রা বাজারে ছড়াইয়া পড়ে; (৫) হীন মূল্যে টাকা প্রস্তুত করিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রতি টাকায় যে ।৶০, ।৶০ লাভ করেন তাহা সরকারী সাধারণ তহবিলে জমা করা হইবে না। ইহা দ্বারা স্বর্ণমান প্রচলনের উদ্দেশ্যে একটা স্বতন্ত্র স্বর্ণ-তহবিল (Gold Standard Reserve) খোলা হইবে, যাহাতে সমস্ত রৌপ্যমুদ্রা ইহার সাহায্যে ধীরে ধীরে কিনিয়া লওয়া যাইতে পারে; (৬) গভর্ণমেণ্টকে যে অর্থ ভারতবর্ষে ব্যয় করিতে হয় টাকার পরিবর্ত্তে তাঁহারা তাহা স্বর্ণমুদ্রায় করিবেন; (৭) বিনিময়ের হার ১ শিলিং ৪ পেনি হিসাবে ধরা হইবে এবং টাকা হীনমুদ্রা হইলেও জনসাধারণ কর্ত্তৃক তাহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ করা হইবে না।

স্বর্ণমানের প্রধান উপকরণ বা উপাদান নিজ দেশে অবাধে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুতের অধিকার। এই গোড়ার অধিকারটি বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের আপত্তির দরুণ ভারতবর্ষকে দেওয়া হইল না। স্বর্ণ-তহবিল ধীরে ধীরে রৌপ্য-মুদ্রাকে টানিয়া লইয়া স্বর্ণমানের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে, স্বর্ণ-তহবিল সৃষ্টির এই উদ্দেশ্যটিও ভারতসচিব অনেকটা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। প্রথমতঃ, এই স্বর্ণ-তহবিল ভারতবর্ষে না রাখিয়া ষ্টার্লিঙে রূপান্তরিত

করিয়া বিলাতে রাখা হইল। দ্বিতীয়তঃ, এই তহবিলের একটা অংশ ভারতের রেলপথ-নির্ম্মাণে ব্যয় হইতে লাগিল। তৃতীয়তঃ, অতিরিক্ত টাকার আবশ্যক হইলে রৌপ্য খরিদের মূল্য দিবার জন্য স্বর্ণ-তহবিলের একাংশ রৌপ্যমুদ্রারূপে ভারতবর্ষে রক্ষিত হইল। ভারতীয় পণ্যের মূল্য দিবার জন্য বা অন্য কারণে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে স্বর্ণ পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে ভারতসচিব বাজার দর অপেক্ষা কম মূল্যে তাহাদের নিকট হইতে স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া কাউন্সিল বিল বেচিতে সুরু করিলেন এবং এইরূপ বেচা-কেনার কোনরূপ পরিমাণ বা সীমা নির্দ্দেশ করা হইল না। ফলে বিদেশ হইতে ভারতে স্বর্ণ প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। যে স্বর্ণ ভারতের প্রাপ্য এবং যাহা ভারতে আসিতে পারিলে নানা উপায়ে ভারতের ধনবৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারিত তাহা বিলাতেই রহিয়া গেল; এবং তথায় আমাদের নামে জমা থাকিলেও অল্প সুদে ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে ব্যবহৃত হইতে পারিল। এত বড় একটা বিরাট ধনভাণ্ডারের কর্তৃত্ব করিতে পাওয়া সহজ সুবিধা নহে। ইহাতে ইংলণ্ডের মর্য্যাদা ও ধনবল বাহিরে যেমন বাড়িয়া গেল, আমাদের ধন পরহস্তগত হওয়ায় তাহা সম্ভব হইল না। ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নোটের টাকা দিবার জন্য যে পৃথক তহবিল (Paper Currency Reserve) রাখা হয় তাহা হইতে ১৯০৫ সালে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার স্বর্ণ জাহাজে করিয়া বিলাতে পাঠান হয়। ইহার অনুকূলে এই যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, টাকা প্রস্তুতের জন্য ইংলণ্ডে রৌপ্য খরিদকালে ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ আনাইয়া লইতে তিন-চার সপ্তাহ বিলম্ব ঘটিত—ইহাতে সেই অসুবিধা আর হইবে না।

এখানে কাউন্সিল বিলের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আমাদিগকে প্রতি বৎসর হোম চার্জ্জেস দরুণ যে অর্থ বিলাতে দিতে হয় তাহার

জন্য স্বর্ণ আবশ্যক। কিন্তু আমাদের মুদ্রা স্বর্ণমুদ্রা নহে। বাজার হইতে স্বর্ণ ক্রয় করিয়া জাহাজে করিয়া বিলাতে পাঠাইবার হাঙ্গামা ও খরচ এড়াইবার জন্য নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করা হইত। বিলাতের ব্যবসায়ীকে ভারতীয় পণ্য ক্রয় করিবার জন্য মূল্য দিতে হইবে; পক্ষান্তরে ভারতসচিব ভারতবর্ষ হইতে 'হোম চার্জ্জেস' বাবদ বহু অর্থ পাইবেন। সামান্য কিছু খরচ ও কমিশন ধরিয়া ভারতসচিব ইংরেজ ব্যবসায়ীর নিকট হইতে তাহার দেয় স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করেন এবং তদ্বিনিময়ে তাঁহার মারফতে ভারত সরকারের উপর একটি 'পে অর্ডার' দেন। ইহারই নাম কাউন্সিল বিল বা ড্রাফ্‌ট্‌স্‌। ইংরেজ ব্যবসায়ী ইহা ভারতীয় পাওনাদারের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং তিনি এখানকার ট্রেজারী হইতে উহা ভাঙাইয়া লয়েন। বিশেষ তৎপরতার প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত খরচ লইয়া টেলিগ্রামে অর্ডারটি পাঠান হয় এবং তাহাকে টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার বলে। ১৮৯৩ সাল পর্য্যন্ত হোম চার্জ্জেসের পরিমাণ অনুযায়ী কাউন্সিল বিল বিক্রয় করা হইত। কিন্তু ১৮৯৩ সাল হইতে এই বিল যথেচ্ছ পরিমাণে ভারতসচিব বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। ইহার কুফল উপরে উল্লেখ করিয়াছি। বিলাতী পণ্যের মূল্যের দরুণ বা অন্য কারণে আমাদিগকে ইংলণ্ডে টাকা পাঠাইতে হয়। আবার ভারতসচিবেরও এদেশে টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হয়। এই অবস্থায় ভারতীয় ট্রেজারীতে টাকা জমা দিয়া আমরা 'রিভার্স কাউন্সিলস্‌' ক্রয় করিয়া আমাদের পাওনাদারের নিকট পাঠাইয়া দিলে তিনি তাহা ভারতসচিবের নিকট হইতে ভাঙাইয়া লইতে পারেন। এই কাউন্সিল বিল ও রিভার্স কাউন্সিল সদা-পরিবর্ত্তনশীল বিনিময়ের হার ঠিক রাখিবার অন্যতম উপায় স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। নির্দ্দিষ্ট হার হইতে টাকার মূল্য কমিবার সম্ভাবনা

হইলেই রিভার্স কাউন্সিল বিক্রয়ের দ্বারা বাজার হইতে চল্‌তি টাকার পরিমাণ হ্রাস (contraction of currency) করিয়া ফেলা হইত। পক্ষান্তরে টাকার মূল্য বাড়িবার উপক্রম করিলেই ভারতসচিব কাউন্সিল বিল বিক্রয় করিতে সুরু করিতেন এবং তদ্দকণ ভারতীয় ট্রেজারী হইতে টাকা বাহির হইয়া বাজারে ছড়াইয়া পড়িত। ফলে বাজারে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি (expansion of currency) পাইয়া তাহার মূল্য আর বাড়িতে পারিত না। অতিরিক্ত প্যাঁচান মুদ্রানীতিকে বাঁচাইবার জন্য ইহাকে অন্যতম ব্যর্থ চেষ্টা বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে ১৮৯৯ সাল হইতে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত যে-ভাবে কাজ চলিতে লাগিল তাহার স্বরূপ সংক্ষেপে দিতেছি :—

(১) টাকা ও বিলাতী সভারিন (পাউণ্ড-ষ্টার্লিং) এই দ্বিবিধ মুদ্রাই আইনসঙ্গত প্রকৃষ্ট মুদ্রা (legal tender) রূপে গণ্য হইত; (২) সভারিনের মূল্য ১৫ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল (অর্থাৎ ১ শিলিং ৪ পেনি=১ টাকা); (৩) স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে রৌপ্যমুদ্রা দাবি করা চলিত; (৪) কিন্তু রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা দাবি করা চলিত না, তবে প্রয়োজন অনুযায়ী ও সাধ্যমত তাহা দেওয়া হইত; (৫) টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেনির নিম্নে নামিতে চাহিলে রিভার্স কাউন্সিল বিক্রয় করিয়া যেমন তাহার মূল্যহ্রাস ঠেকান হইত, তেমনি টাকার মূল্য বাড়িবার উপক্রম করিলে উল্লিখিত ৩য় দফার বিধান অনুযায়ী বাজারে চলতি টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া ও স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ কমাইয়া ফেলিয়া টাকার মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা করা চলিত।

এদিকে গভর্ণমেণ্টের মুদ্রানীতি সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা এক ভাবেই চলিতে থাকে এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজস্ব সচিব স্যর অষ্টিন চেম্বারলেনের সভাপতিত্বে ১৯১৪ সালে এক কমিশন

নিয়োগ করেন। তাঁহারা অনেক গবেষণা করিয়া ভারতবাসীরা স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ চাহেন না এবং ভারতের জন্য রৌপ্যমুদ্রা ও নোট প্রচলনই প্রশস্ত, ইহাই নির্দ্ধারণ করেন এবং ঘটনাচক্রে 'গোল্ড এক্স্‌চেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড' নামে যে অভিনব মুদ্রানীতির প্রচলন হইয়াছে তাহাই সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। এদিকে ১৯১৪ সালে ইউরোপে লঙ্কাদহন পালা সুরু হয়, এবং বিশ্বব্যাপী অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সহিত ভারতের এই অস্বাভাবিক মুদ্রার ব্যবস্থাও একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। লড়াইয়ের সাজসরঞ্জাম, মালমশলা জোগাইবার জন্য ভারতের রপ্তানী অসম্ভব বৃদ্ধি পায়; অথচ প্রধান দেশসমূহ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় ভারতে তাহাদের পণ্যের আমদানী স্বভাবতই অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ভারত-সরকারকে বৃটিশ সরকারের পক্ষে ছয় বৎসরে ২৪ কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং (অর্থাৎ ৩৬০ কোটি টাকা) ব্যয় করিতে হয়। এদিকে লড়াইয়ের দরুণ কোন দেশই অন্যান্য জিনিষের ন্যায় রৌপ্যকেও হাতছাড়া করিতেছিল না। এই কারণে রূপার দর অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি পায়। ১৯১৫ সালে প্রতি আউন্স রৌপ্যের মূল্য ২৭ পেনি ছিল; ১৯২০ সালে তাহা ৮৯ পেনিতে আসিয়া দাঁড়ায়! অতিরিক্ত রপ্তানীর মূল্য দিবার জন্য যে অতিরিক্ত কাউন্সিল বিল বিলাত হইতে আসিতে লাগিল তদ্দরুণ এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বরাতি উল্লিখিত লড়াইয়ের ব্যয়সঙ্কলনের দরুণ যে অত্যধিক টাকার প্রয়োজন হইল তাহার জন্য অগ্নিমূল্যে রৌপ্য খরিদ করিতে হইল। হিসাব বহির্ভূত এই বিরাট ব্যয়সঙ্কলনের জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্টকে অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিতে এবং ১৯১৭-১৯ সাল মধ্যে ১৩০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। বিপাকে পড়িয়া ১৯১৯ সালে স্মিথ কমিটি নামে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। ইঁহারা রৌপ্য মূল্যের এতাদৃশ বৃদ্ধি দেখিয়া

বিনিময়ের হার ১ শিলিং ৬ পেনির স্থলে একেবারে ২ শিলিং নির্দ্ধারিত করিলেন। বিলাতের দেনা দিবার জন্য ভারতে যে রিভার্স কাউন্সিল বিক্রয় করা হইত তাহার দাবি মিটাইতে হইত বিলাতের গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড রিজার্ভ ও পেপার কারেন্সী রিজার্ভ হইতে। এই তহবিলের স্বর্ণ কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্য সিকিউরিটিতে খাটান হইত। টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি থাকাকালীন এই সব সিকিউরিটি খরিদ হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে ভারত সরকার রিভার্স কাউন্সিল ২ শিলিং দরে বিক্রয় করায় ভারত সচিবকে প্রতি টাকায় ৬ পেনি কমিয়া দেখা দিতে হইল এবং ফলে ৪০ কোটি টাকার উপর ভারত-সরকারের ক্ষতি হইয়া গেল। এই সময়ে চারি দিক হইতে বিলাতে স্বর্ণ পাঠাইবার ধুম পড়িয়া গেল; বিনিময়ের হার এতটা বাড়িয়া যাওয়ায় বিলাতী মালের দর আমাদের দেশে সস্তা হইল এবং আমাদের মালের দর বিলাতে চড়িয়া গেল। ফলে অত্যধিক আমদানী বৃদ্ধি ও রপ্তানী হ্রাস পাইয়া দেশ হইতে অর্থ বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। এদেশীয় ইংরেজ বণিক যাহারা এদেশে যুদ্ধের সময় বহু টাকা রোজগার করিয়াছিল তাহারাও এইরূপ উচ্চ বাট্টার হারের সুবিধা গ্রহণ করিয়া লাভের কড়ি সব বিলাতে পাঠাইতে লাগিল। ভাগ্যান্বেষীরা এই সময়ে লাভে বিলাতে টাকা পাঠাইয়া পুনরায় বাট্টার হার নামিলে লাভে টাকা এদেশে ফিরাইয়া আনিবেন মতলবে খুব রিভার্স বিল কিনিতে লাগিলেন। ফলে টাকার বাজার জুয়ার আড্ডায় পরিণত হইল এবং চারিদিকে একটা গুরুতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। স্মিথ কমিটির একমাত্র ভারতীয় সদস্য স্যার দাদিবা দালাল টাকার মূল্য ২ শিলিং হার নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই খুব জোর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল

তাহা স্যর ষ্ট্যানলী রিডের নিম্নলিখিত মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারা যাইবে :—

A policy which was avowedly adopted to secure fixity of exchange produced the greatest fluctuations in the exchanges of a solvent country and widespread disturbances of trade, heavy losses to the Government and brought hundreds of big traders to the verge of bankruptcy.

স্মিথ কমিটির নিতান্ত অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত বজায় রাখিতে অসমর্থ হইয়া ১৯২১ সাল হইতে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত ভারত সরকার নিশ্চেষ্টভাবে ঘটনাস্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন—যদি দৈবাৎ সুদিনের নাগাল পাওয়া যায় এই ভরসায়। ১৯২৫ সালে ষ্টার্লিঙের মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনিতে আসিয়া স্বর্ণমূল্যের সমান দাঁড়াইল এবং গভর্ণমেণ্ট টাকার মূল্যও ১ শিলিং ৬ পেনি অপেক্ষা যাহাতে অধিক না হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৯২৬ সালে হিলটন্ ইয়ং কমিশন 'গোল্ড বুলিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিলেন। তাহার প্রধান সূত্রগুলি এইরূপ :—যদিও আইনতঃ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করা হইবে না, তথাপি স্বর্ণদ্বারা জিনিষের মূল্যের পরিমাপ করা হইবে এবং রৌপ্যমুদ্রার মূল্য আইন করিয়া স্বর্ণের সহিত পাকাপাকি রকমে বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। ভারত-গভর্ণমেণ্ট উক্ত বাঁধা হারে যথেচ্ছ পরিমাণ স্বর্ণথান সর্ব্বসাধারণের নিকট ক্রয় ও বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবেন; কিন্তু পরিমাণে কেহ ১০৬৫ তোলা বা ৪০০ আউন্সের কম সোনা দিতে বা চাহিতে পারিবেন না। নোট বা টাকার পরিবর্ত্তে যে-কোন উদ্দেশ্যে ন্যূনকল্পে উক্ত পরিমাণ স্বর্ণথান দাবি করা চলিবে। স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন বন্ধ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সাধারণের চাহিদা মত স্বর্ণথান দিবার নিয়ম করায় অর্থের পরিমাণ

সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা বিনিময়ের হার ঠিক রাখা অধিকতর সহজ হইবে এই ব্যবস্থা হইতে ইহারা এই সুবিধা আশা করিলেন। একটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার তাহার উপরে দিবার জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটী প্রস্তাবও ইঁহারাই করিলেন। এতকাল গভর্ণমেণ্ট বিনিময়ের যে হার নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছেন তাহা স্থির রাখা সম্বন্ধে তাঁহাদের আইনতঃ কোন দায়িত্ব ছিল না। এক্ষণে ঐ দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের উপর বিধিমত আরোপিত হওয়ায় বাট্টার অনিশ্চয়তা অনেকটা হ্রাস পাইল। কিন্তু বাট্টার এই হার নির্দ্ধারণ করা লইয়া তুমুল তর্ক উপস্থিত হইল। উক্ত কমিশনের সুবিখ্যাত ভারতীয় সদস্য স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ১ শিলিং ৬ পেনি হার নির্দ্ধারণে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিয়া ১ শিলিং ৪ পেনি হার সমর্থন করিলেন। তিনি নানা প্রকারে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, ১ শিলিং ৪ পেনিই স্বর্ণের সহিত রৌপ্যের স্বাভাবিক হার। ১৮৯২ সালে হার্সেল কমিটি এই হারই নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন এবং ইহাই পঁচিশ বৎসর কাল (১৮৯২ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত) চলিয়া আসিতেছিল। লড়াইয়ের অভাবনীয় বিভ্রাটের দরুণ ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে ১৯১৯ সালে স্মিথ কমিটি নিতান্ত গায়ের জোরে এই অস্বাভাবিক সাময়িক অবস্থাকে স্থায়ী করিবার চেষ্টা করেন—ভারতের ভাগ্যে তাহার পরিণামও ভয়াবহ হয়। ভারত-গভর্ণমেণ্ট যখন এই ২ শিলিং হার রক্ষা করিবার নিষ্ফল চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তখন (১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে) বিনিময়ের হার স্বাভাবিক নিয়মে ১ শিলিং ৪ পেনির কাছাকাছি নামিয়া

---

১ আইন-প্রণয়ন কালে ৪০ তোলার অনধিক স্বর্ণ ক্রয় করিতে গভর্ণমেণ্ট বাধ্য নহেন ইহাই নির্দ্ধারিত হয়।

আসিয়াছিল। সরকারী কাগজপত্র হইতে তিনি ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, স্বর্ণের সহিত রৌপ্যের যাহা স্বাভাবিক হার, তাহার কিছু উর্দ্ধে হার নির্দ্ধারণ করিবার মতলব ভারত-সরকার পূর্ব্ব হইতেই পোষণ করিতেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট তরফ হইতে প্রয়োজন অনুযায়ী মুদ্রার স্বাভাবিক প্রসারণ (expansion of currency) বন্ধ করিয়া বাট্টার স্বাভাবিক হার বেশী করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। বাট্টার হার ১ শিলিং ৬ পেনি হইলে ভারতের সর্ব্বপ্রকারে কিরূপ অকল্যাণ হইবে তাহাও তিনি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ভারতের কৃষিজীবী ও অন্যান্যের দেনার পরিমাণ প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। ইহার অধিকাংশ দেনা যখন করা হয় তখন টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেনি ছিল; এক্ষণে উহার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি ধরা হইলে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া হেতু দেনার পরিমাণ প্রকৃতপ্রস্তাবে শতকরা ১২॥ আনা বৃদ্ধি পাইয়া যাইবে। ভারতের এই অসহায় গরিবদের কথা ভুলিলে চলিবে না। বিনিময়ের হার অকারণে বেশী না ধরিয়া ১ শিলিং ৪ পেনি ধরিলে বিদেশে আমাদের মালের মূল্য ষ্টার্লিঙের হিসাবে কম পড়িবে এবং বিদেশী মালের মূল্য টাকার হিসাবে এদেশে বেশী পড়িবে; সুতরাং আমাদের আমদানী কমিয়া রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে; বাণিজ্যের গতি (balance of trade) আমাদের অধিকতর অনুকূল হইবে ফলে ধনাগম হইয়া দেশের সমৃদ্ধি বাড়িবে। ইহাতে জিনিষের মূল্য চড়িলেও এতদ্দেশীয় শতকরা ৭১ জন কৃষিজীবী তাহাদের কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বেশী পাইয়া লাভবানই হইবে। লেখাপড়া জানা অল্প বেতনের চাকুরিয়াদের কিছু কষ্ট হইবে সত্য কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বিবেচনা করিয়া তাহা ধর্ত্তব্য নহে। মজুরদের মজুরী লড়াইয়ের সময়ে অপ্রত্যাশিত ব্যবসা স্ফীতির দরুণ এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, জিনিষের দর কিঞ্চিৎ

বাড়িলেও তাহাদের বর্দ্ধিত মজুরীর ষোল আনাতে হাত পড়িবে না। “হোম চার্জ্জেস” বা বিদেশীয় ঋণ দেনার জন্য আমাদিগকে যে টাকা বেশী দিতে হইবে তাহা অতিরিক্ত শুল্ক ও অন্যান্য পাওনা ও সুবিধা দ্বারা পোষাইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ তাঁহার মতের সহিত এক মত হইতে পারেন নাই, এবং ১৯২৭ সালের মুদ্রা-আইনে অন্যান্য সর্ত্ত সহ তাঁহাদের অনুমোদিত বাট্টার হারই নিবন্ধ হয়। এই মুদ্রানীতির নামকরণ হইল—গোল্ড বুলিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড (Gold Bullion Standard)।

১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দুনিয়ার আর্থিক অবস্থা ভালর দিকেই চলিল। কিন্তু তাহার পর হইতেই অপ্রতিহত গতিতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস ও সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের অধোগতি হইতে সুরু করিল এবং দেশে দেশে বেকার সমস্যা বাড়িয়া চলিল। ১৯৩১ সালের নবেম্বর মাসে ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রৌপ্যমুদ্রাও স্বর্ণ হইতে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া পুনরায় ষ্টার্লিঙের সহিত যুক্ত হইল। বাট্টার হার ১ শিলিং ৬ পেনিই রহিল কিন্তু স্বর্ণের সহিত নহে, ষ্টার্লিঙের সহিত। ষ্টার্লিঙের সহিত সম্বন্ধ হেতু ইহাকে 'ষ্টার্লিং এক্স্চেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড' বলা হয়। স্বর্ণমান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ষ্টার্লিঙের মূল্য যেমন অনির্দ্দিষ্টরূপে অনেকখানি নামিল, আমাদের রৌপ্যমুদ্রাও সঙ্গে সঙ্গে তেমনই নামিলেন। আজ পর্য্যন্ত সেই অবস্থাই চলিয়াছে—রাজার জয়ে জয়, রাজার ক্ষয়ে ক্ষয়। রাজভাগ্য অনুসরণ করা পরম সৌভাগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু একটা ক্ষোভ এই যে, গোল্ড এক্স্চেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ষ্টার্লিং এক্স্চেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড, বুলিয়ান এক্স্চেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি স্বর্ণমানের গিল্টি করা বহুরূপ আমরা রাজ-অনুগ্রহে দেখিলাম কিন্তু স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি এবং বহু

তোড়জোড় সত্ত্বেও স্বর্ণমানের সহজ সুন্দর রূপটির দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না।

আমদানী হ্রাস ও রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়া যাহাতে ধনাগম ও পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হয় এতদুদ্দেশ্যে দুনিয়ার সব জাতিই আজ নিজ নিজ মুদ্রামূল্য যথাসম্ভব হ্রাস করিয়া বিনিময়ের সুবিধা গ্রহণের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু আমাদিগকে ১৯২৭ সাল হইতে বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেই যে ১ শিলিং ৬ পেন্স হারের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই বন্ধন হইতে আজও আমাদের মুক্তি ঘটিল না। তবে আমাদের একটি পরম সান্ত্বনা এই, অর্থশাস্ত্রের মুদ্রাতত্ত্বের অধ্যায়ে আমাদের দান নাকি অমূল্য, বড় বড় পণ্ডিতেরাও নাকি ইহা হইতে অনেক নূতন তথ্য জানিতে এবং অনেক চিন্তার খোরাক সংগ্রহ করিতে পারেন।

আমাদের 'রেশিও' সমস্যা

রেশিও প্রশ্ন লইয়া ভারতব্যাপী একটা ঝড় বহিয়া গেল। এত প্রচণ্ড তার আকর্ষণ যে, কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ হইতে বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র পর্য্যন্ত টাল সামলাইতে পারেন নাই। যার আমরা অনেকেই ভালমন্দ বিশেষ কিছু বুঝিতে না পারিয়া পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিয়াছি। শাস্ত্রের কচ্‌কচি নীরব হইয়া আসিয়াছে, ঝড়ের বেগ কমিয়া গিয়াছে; সুতরাং সাধারণের পক্ষে ধীর ভাবে বিষয়টি বুঝিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সেই জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রারম্ভে 'রেট অব্ এক্‌শ্চেঞ্জ' বা বিনিময়ের হার, এই কথাটার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। বিভিন্ন দেশের মুদ্রার ওজন নির্দ্দিষ্ট করা হইলেও এক এক দেশের মুদ্রার ওজন এক এক রকম। এই ওজনের পার্থক্যের দরুণ ইহাদের মূল্যের যে তারতম্য, 'রেট অব্ এক্‌স্‌চেঞ্জ' তাহাই গণিতের সাহায্যে নির্দ্দেশ করিয়া দেয় মাত্র। ইহাকেই সংক্ষেপে 'রেশিও' বলা হয়।

পৃথিবীব্যাপী মুদ্রাবিভ্রাট ঘটিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একটা বিলাতী স্বর্ণমুদ্রা ফ্রান্সের ২৫·২২টি, জার্ম্মাণীর ২০·৪৬টি, এবং আমেরিকার ৪·৮৬টি স্বর্ণমুদ্রার সমতুল্য ছিল। একই ধাতুর বিভিন্ন মুদ্রামধ্যে বিনিময়ের হার নির্দ্ধারণ করা খুবই সহজ। কিন্তু এক দেশের মুদ্রা স্বর্ণ-নির্ম্মিত, অপর দেশের মুদ্রা রৌপ্যনির্ম্মিত হইলে উভয় ধাতুর আপেক্ষিক

মূল্যের অ-স্থিরতা হেতু উহাদের মধ্যে বিনিময়ের হার নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডের স্বর্ণমুদ্রা ও ভারতের রৌপ্যমুদ্রার মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় সেইজন্যই চিরকাল দ্বন্দ্বহন্দ্বের সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান আন্দোলন সেই বহু পুরাতন কলহেরই একটা নবপর্য্যায় মাত্র। ভারতের লেন-দেন প্রধানতঃ ইংলণ্ডের সহিত; তথাপি কেন যে ইংরেজ সরকার ভারতে স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করিয়া উভয় দেশের আর্থিক সম্পর্কের মধ্যে এই নিদারুণ অনির্দ্দিষ্টতা বা ভেদের সৃষ্টি করিলেন তাহা বোঝা কঠিন। যাহা হউক, সেই আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় নহে; এই সম্বন্ধে আমি "ভারতে মুদ্রানীতি" প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক্।

কোন দেশের বাণিজ্যই আর এখন শুধু সেই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; গোটা দুনিয়ার সহিত এখন আমাদের কারবার। সেইজন্যই পরস্পরের দেনা-পাওনা স্থির করিবার জন্য বিভিন্ন দেশের মুদ্রামধ্যে বিনিময়ের হার নির্দ্দিষ্ট রাখা একান্ত আবশ্যক। এতকাল ছিলও তাই। বিগত মহাযুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ইউরোপের দেশসমূহ স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় এই নির্দ্দিষ্ট হারের নড়চড় হইয়া যায়। পরে শান্তিস্থাপনের সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা প্রতিষ্ঠিত হইলে স্বাভাবিক অবস্থা পুনরায় ফিরিয়া আসে। কিন্তু কিছুকাল মধ্যেই যুদ্ধের পরবর্ত্তী কুফল ধীরে ধীরে ফলিতে সুরু করে এবং ইংলণ্ড হৃত-সর্ব্বস্ব হইবার অবস্থায় পড়িয়া ১৯৩১ সালে পুনরায় স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে। সঙ্গে সঙ্গে জাপান, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য দেশও আত্মরক্ষার জন্য স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তদবধি পৃথিবীব্যাপী এই মুদ্রাবিভ্রাটের

পালা চলিয়াছে, ইহার শেষ কোথায় কি ভাবে কেহ বলিতে পারে না।

স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া নিজের দেশের দেনা পরিশোধের জন্য স্বর্ণমুদ্রা দিবার দায় হইতে গবর্ণমেন্ট রক্ষা পাইলেন, কেবল বিদেশের দেনা পরিশোধ করিবার বেলাই স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণপাতের প্রয়োজন থাকিল। স্বর্ণমুদ্রার স্থান যখন কাগজের নোট অধিকার করিল, তখন মুদ্রার ধাতুমূল্য দ্বারা বিভিন্ন দেশমধ্যে বিনিময়ের হার নির্দ্ধারণের যে সহজ উপায়টি ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গেল এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দেনা-পাওনা স্থির করা দুরূহ হইয়া পড়িল। স্বর্ণভ্রষ্ট হওয়ার ফলে ইংলণ্ড এবং ঐ পথাবলম্বী অন্যান্য দেশের মুদ্রার মর্য্যাদা বা কদর হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। যেখানে একটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং ৪'৮৬ ডলারের সমতুল্য ছিল সেখানে তাহার মূল্য দাঁড়াইল ন্যূনকল্পে ৩'৩০ ডলার।

আর্থিক জগতে ইংলণ্ডের মর্য্যাদা হানি হইল যথেষ্ট, কিন্তু সে প্রাণে বাঁচিয়া গেল। প্রথমতঃ, তহবিলের অবশিষ্ট স্বর্ণগুলি তাহার রক্ষা পাইল। দ্বিতীয়তঃ, মুদ্রার মূল্য হ্রাস হেতু জিনিষের দর চড়িল। তৃতীয়তঃ, বিনিময়ের হার তাহার অনুকূল হওয়ায় রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস পাইয়া তাহার ধনাগম ও ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি হইতে লাগিল। অন্ততঃ প্রতিকূল হাওয়া অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হইল। হাজার পাউণ্ডের জিনিষ ইংলণ্ড হইতে ক্রয় করিলে আমেরিকার বণিককে পূর্ব্বে দিতে হইত (১০০০ × ৪'৮৬) ৪৮৬০ ডলার, এক্ষণে দিতে হইল আনুমানিক (১০০০ × ৩'৩০) ৩৩০০ ডলার মাত্র। ইংলণ্ড তাহার পণ্যের দরুণ হাজার পাউণ্ডই পাইল বটে; কিন্তু আমেরিকাকে ১৫৬০ ডলার কম দিতে হইল। ফলে আমেরিকা ও স্বর্ণমান বিশিষ্ট অন্যান্য দেশে ইংরেজের মাল কেবলমাত্র বিনিময়ের

মারপ্যাঁচের দরুণ সস্তায় বিকাইতে লাগিল। পক্ষান্তরে উহাদের পণ্যের দর ইংলণ্ডের বাজারে চড়িয়া গেল। প্রবল প্রতিযোগিতার ফলে দুনিয়ার হাটে পণ্য বিক্রয় এমনি দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তদুপরি মুদ্রার অবনতি ঘটাইয়া বাট্টার সুযোগ গ্রহণে ইংলণ্ডকে লাভবান হইতে দেখিয়া এই মন্দার বাজারে আমেরিকাও সেই পথের পথিক হইতে বাধ্য হইল। ফলে চারিদিকে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রামূল্য হ্রাস করতঃ কে কাহাকে পণ্যের হাটে হটাইবে তাহার একটা রীতিমত দৌড় চলিয়াছে।

এই সম্পর্কে ভারতের অবস্থা সম্যক বুঝিতে হইলে অনভিজ্ঞের পক্ষে পারিপার্শ্বিক অবস্থাও কিঞ্চিৎ জানা আবশ্যক। সেইজন্যই দুনিয়ার আর্থিক সমস্যার এই দিকটা যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

ভারতের মুদ্রা রৌপ্য ধাতুর হওয়ায় পৃথিবীর স্বর্ণমুদ্রাবিশিষ্ট দেশ সমূহের সহিত বিনিময়ের হার বা 'রেশিও' লইয়া তাহার গোলমাল যে চিরন্তন হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সোনা ও রূপার বাজার দরের পরিবর্ত্তন হেতু ষ্টার্লিঙের সহিত টাকার রেশিও স্থির করিবার কোন সহজ ও স্বাভাবিক উপায় না থাকায় ভারত-সরকার এই হার খেয়ালমত এক এক সময় এক এক রূপ নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছেন। ইহার ফল ভারতের পক্ষে শুভ হইতে পারে নাই। প্রথম কথা—বিনিময়ের হার পরিবর্ত্তনশীল হইলে লাভালাভ হিসাব করিয়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য করা কঠিন হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, যাহা এইমাত্র আলোচনা করা হইল, বিনিময়ের হার বা রেশিও নির্দ্ধারণের উপর জিনিষের দর ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি অবনতি অতি গুরুতররূপে নির্ভর করে। ১৮৯২ সাল হইতে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত টাকার মূল্য ১

শিলিং ৪ পেনি নির্দ্দিষ্ট ছিল; তৎপরে ১৯১৯ সালে টাকার মূল্য বাড়াইয়া একেবারে ২ শিলিং করা হয়। তাহার ফল ভারতের পক্ষে অতিশয় মারাত্মক হইয়া পড়িলে পুনরায় ১৯২৬ সালে এক রয়্যাল কমিশন বসে এবং উঁহারা টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। এইরূপ ঘাতপ্রতিঘাত ও অনিশ্চয়তার ভিতর দিয়া ভারতের মুদ্রা-সমস্যা এতকাল চলিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর বাণিজ্য তখন সম্প্রসারণের পথ বাহিয়া চলিতেছিল; ভারতের ক্ষতি তাই তেমন করিয়া তাহার গায়ে বাজিতে পারে নাই। কিন্তু আজ আর সেদিন নাই; আজ দু কূল ভাঙ্গা খরস্রোতে উজান বাহিবার পালা সুরু হইয়াছে। আমাদের প্রভুদের অবস্থাও কাহিল। বড় বাড়ির আনন্দোৎসবের একটুকু ছিটেফোঁটা পাইবার আশাও আজ আর দান প্রতিবেশীর নাই। দুনিয়ার চারিদিকে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আজ কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। 'কাজ চাই, অন্ন চাই' রবে ইউরোপ আমেরিকার আকাশ বাতাস আজ ভারী হইয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রপতিগণের চোখের নিদ্রা টুটিয়াছে। কোটি কোটি টাকার পণ্য পড়িয়া আছে, খরিদ্দার নাই, দর নাই। সকল দেশই নিজের পণ্য পরের দেশে চালান করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে ব্যস্ত; কিন্তু কেহই পরের পণ্য নিজের দেশে প্রবেশ করিতে দিবেন না। যিনি দরে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তিনি পরের পণ্যের উপর উচ্চ শুল্ক বসাইতেছেন। তাহাতে আঁটিয়া উঠিতে না পারিলে, স্বর্ণমুদ্রা ত্যাগ করিয়া যথাসম্ভব কাগজ চালাইতে সুরু করিয়াছেন; নয়ত মুদ্রার স্বর্ণ অপহরণ করিতেছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ রুসভেল্ট কলমের এক খোঁচায় ডলারের ওজন সেদিন অর্দ্ধেক কমাইয়া দিয়াছেন। উদ্দেশ্য নিজের দেশের জিনিষের দর চড়াইয়া দেওয়া এবং বিদেশের হাটে প্রতিযোগিতায় অপরকে

পরাস্ত করা। রাতারাতি আমাদের আধুলিগুলি টাকা হইয়া গেলে যা হয়, এ ঠিক তাই। অর্থশাস্ত্রের যাদুমন্ত্রে মানুষের হাল্কা পকেট যখন রাতারাতি দ্বিগুণ ভারী হইয়া উঠিবে তখন বাজারে ক্রেতার ভিড় নিশ্চয়ই কিছু বাড়িবে এবং নিজের পণ্য বিদেশে অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করিবার সুবিধাও হইবে, ইহাই এই নীতির উদ্দেশ্য।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, চারিদিকের অবস্থা ও ব্যবস্থা যখন এইরূপ, তখন আমাদের দেশের মুদ্রা-নীতি কোন পথে চলিয়াছে? ইহার সহজ উত্তর এই যে, আমাদের নির্দ্দিষ্ট পথও নাই, চলাও বন্ধ। আমাদের এই চরম নিশ্চেষ্টতার দিকে তাকাইলে পুরাতন সেই প্রবাদটির কথা মনে পড়ে, কাঙ্গালের আবার বাটপাড়ের ভয় কি? সেই যে ১৯২৭ সালে সুদিনে আমাদের টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, দুনিয়ার এত ওলটপালটের পরও সেই বাট্টা বা রেশিও-ই এখন পর্য্যন্ত স্থির আছে। পার্থক্যের মধ্যে এইটুকু, পূর্ব্বে সম্বন্ধ ছিল স্বর্ণ ষ্টার্লিংএর সহিত, এখন সম্পর্ক হইয়াছে পেপার ষ্টার্লিঙের সহিত; কারণ ইংলণ্ডের ষ্টার্লিং এখন স্বর্ণ হইতে সম্বন্ধচ্যুত। ১৯২৭ সালে রয়্যাল কমিশন কর্ত্তৃক ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিও যখন নির্দ্ধারিত হয় তখনই কমিশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্য অর্থনীতি-বিশারদ স্যর পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, স্বর্ণ ও রৌপ্য ধাতুর পারস্পরিক মূল্য বিবেচনা করিলে বাট্টার হার কখনও ১ শিলিং ৪ পেনির বেশী হওয়া উচিৎ নহে। কিন্তু তাঁহার অভিমত অন্যান্য সদস্যগণ গ্রহণ করেন নাই। সুদিনে যে বাট্টার হার অধিক এবং ভারতের পক্ষে অহিতকর বলিয়া ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়াছিল, আজ এই বিশ্বব্যাপী ঘোর দুর্দ্দিনেও তাহাই স্থির আছে।

আমরা কোন্ হিসাবে বা কি সূত্রে ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিওকে বেশী বলিতেছি, এক্ষণে তাহাই বিচার করিয়া দেখা যাক। লড়াইয়ের পর ইউরোপের প্রধান দেশসমূহ যখন স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন লড়াইয়ের পূর্ব্বে ষ্টার্লিংয়ের যে মূল্য ছিল ইংলণ্ড সেই মূল্যই গ্রহণ করিল। কিন্তু ফ্রান্স, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশ স্বর্ণের পরিমাণ বা ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা কমাইয়া দিয়া তবে পুনরায় স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করিতে সাহসী হইল। মোট কথা, লড়াইয়ের পূর্ব্বে যে মূল্য ছিল তদপেক্ষা কেহই নিজ নিজ মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি করেন নাই, বরং হ্রাস করিয়াছেন। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, লড়াইয়ের পূর্ব্বে ২৫ বৎসর কাল আমাদের টাকার মূল্য ছিল ১ শিলিং ৪ পেনি। লড়াইয়ের পর হঠাৎ তাহা বৃদ্ধি পাইয়া হইল একেবারে ২ শিলিং। তারপর ইহার ফলে ধন নিঃসরণ হইয়া ভারতের যখন নাভিশ্বাস উপস্থিত হইল তখন ইহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইল ১ শিলিং ৬ পেনি। তথাপি লড়াইয়ের পূর্ব্বকার মূল্য অপেক্ষা ইহার মূল্য ২ পেনি বেশী ধরা হইয়াছে। কেহ হয়ত বলিতে পারেন, পূর্ব্বে মূল্য কম ছিল; ২ পেনি মূল্য বাড়াইয়া দিয়া টাকা ও ষ্টার্লিংএর মূল্যের মধ্যে সত্যকার সামঞ্জস্য করা হইয়াছে। এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারিতাম যদি বিজ্ঞানসম্মত অন্যরূপ বিপরীত প্রমাণ কিছু না থাকিত।

বিজ্ঞান-সম্মত বিচার করিতে হইলে উভয় দেশের পণ্যের মূল্য-তালিকার দিকে তাকাইতে হইবে। টাকা ও ষ্টার্লিংএর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট রেশিও যদি খাঁটি রেশিও হয়, তবে ইংলণ্ডে জিনিষের দর ষ্টার্লিংএর মূল্যের সহিত যেমন ওঠানামা করিবে, ভারতেও টাকার মূল্য এবং জিনিষের দর অনেকটা সেই অনুপাতে ওঠানামা করিবে।

কিন্তু ফলতঃ তাহা হয় নাই। ১৯৩১ সালে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিবার পর ইংলণ্ডে জিনিষের দর কিছু চড়িয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে চড়া দূরের কথা, আরও খানিকটা নামিয়াছে। ভারতের ন্যায় সমাবস্থাবিশিষ্ট অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিলাণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য কৃষি প্রধান দেশের মূল্য তালিকার সহিত আমাদের মূল্য-তালিকার তুলনা করিলেও সেই একই অবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইবে। স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিবার পর ঐ সকল দেশে জিনিষের দর বেশ খানিকটা চড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের রৌপ্যমুদ্রা স্বর্ণ হইতে সম্বন্ধচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও এদেশে পণ্যের মূল্য হ্রাস ভিন্ন বৃদ্ধি পায় নাই। এই সব দেশের লড়াইয়ের পূর্ব্বেকার কয়েক বৎসরের মূল্য তালিকার সহিত বর্ত্তমান মূল্য-তালিকা মিলাইলে দেখিতে পাইব ইহাদের পণ্যের মূল্য আমাদের দেশের তুলনায় অনেক কম হ্রাস পাইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা মোটেই অসঙ্গত হইবে না যে, আমাদের দেশের মুদ্রার আপেক্ষিক মূল্য নিরূপণ ঠিক হয় নাই এবং ষ্টার্লিংএর সহিত তুলনায় ইহার মূল্য অধিক ধরা হইয়াছে।

তাহার আরও একটা প্রমাণ দিতে পারা যায়। ১৯১০ সালের পূর্ব্বেকার কয়েক বৎসরের হিসাব আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, ভারতের রপ্তানি আমদানি অপেক্ষা প্রায় ৮৪।৮৫ কোটি টাকা বেশী ছিল। কিন্তু উহা পরবর্ত্তী তিন বৎসরে ক্রমান্বয়ে নামিয়া ১৯৩২-৩৩ সালের শেষে মাত্র ৪ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। বিশ্বব্যাপী ব্যবসা মন্দার দোহাই দিয়া ভারতের বহির্বাণিজ্যের এই দুর্গতিকে চাপা দেওয়া যায় না। কারণ তাহাই যদি সত্য হইত, তাহা হইলে অন্যান্য দেশের, বিশেষতঃ কৃষি প্রধান দেশের, বহির্বাণিজ্যেরও এরূপ অবনতি আমরা দেখিতে পাইতাম। কিন্তু ঐ সব দেশের বাণিজ্যহিসাব

পরীক্ষা করিলে তাহাদের রপ্তানির এতাদৃশ হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায় না। দুনিয়ার সাধারণ অবস্থাই যদি ইহার জন্য দায়ী হইত, তাহা হইলে যে পরিমাণ রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে, সেই পরিমাণ আমদানিও হ্রাস পাইত। কিন্তু তাহা ত হয় নাই। পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে, বাট্টার হার অধিক হইলে তাহা কি প্রকারে দেশের রপ্তানিকে খর্ব্ব ও আমদানিকে সহায়তা দান করে। সেই জন্যই কোন দেশের বাণিজ্য-গতিকে (balance of trade) বৎসরের পর বৎসর অধিকতর প্রতিকূল হইতে দেখিলে আমরা নিঃসংশয়ে ধরিয়া লইতে পারি যে, ঐ দেশের মুদ্রার বহির্মূল্য অতিরিক্ত ধরা হইয়াছে।

অন্য প্রকার পরীক্ষা দ্বারাও আমরা সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব। ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মানী, বেলজিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি দেশ আজও স্বর্ণমান আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। সেই জন্য উহাদের মুদ্রা-মূল্য হ্রাস পাইতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের রৌপ্যমুদ্রা ষ্টার্লিঙের সহিত যুক্ত থাকায় স্বর্ণমুদ্রার তুলনায় তাহার মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাই বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে আমাদের আমদানি ও রপ্তানির হিসাব পৃথক করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, ফ্রান্স, জার্ম্মানী ইটালী, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ হইতে বিদেশী পণ্যের আমদানি এদেশে যে পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে, ইংলণ্ড জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি সেই পরিমাণ হ্রাস পায় নাই। পক্ষান্তরে, ১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি বিশ্বব্যবসার একটু উন্নতি দেখা গেলে, প্রথমোক্ত দেশসমূহে আমাদের পণ্যের রপ্তানি যে-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, শেষোক্ত দেশসমূহে সে-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। ইহা হইতেও আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে ষ্টার্লিঙের তুলনায় আমাদের

মুদ্রার মূল্য আরও কম হইলে ঐ সব দেশেও আমাদের রপ্তানি অন্যান্য দেশের মতই আরও অনেক বেশী হইতে পারিত এবং ঐ সব দেশ হইতে আমাদের দেশে বিদেশী পণ্যের আমদানিও অনেক হ্রাস পাইতে পারিত।

বহির্বাণিজ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের দেশের কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া যে কি পরিমাণ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে তাহা আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ দূরবস্থা হইতে হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিতেছি। আমাদের দেশে কৃষকই প্রধানতঃ ধনোৎপাদন করে। কৃষকের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ায় ডাক্তার, মোক্তার, ব্যবসাদার সকলেই আজ নিরুপায় হইয়াছেন। ১৯২১ হইতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ১০ বৎসরের গড় ধরিলে দেখা যায়, বাংলার কৃষিজাত পণ্যের বাজার দর ৭০ কোটি টাকার উপর ছিল। তন্মধ্যে বাংলার কৃষককে দেনা ও খাজনা ইত্যাদির বাবদ দিতে হয় ৩০ কোটি টাকার বেশী। তাহার মুনাফা থাকে প্রায় ৪০ কোটি টাকা। কৃষক নিজের প্রয়োজনে যে পরিমাণ জিনিষ ব্যবহার করে এই হিসাবে তাহা ধরা হয় নাই। সেই স্থলে ১৯৩২-৩৩ সালে বাংলার কৃষক তাহার ফসলের মূল্য পাইয়াছে মাত্র ৩২ কোটি টাকা। অথচ তাহার দেনার পরিমাণ সেইরূপই আছে। অবস্থা কিরূপ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা শুধু ইহা হইতেই সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। ইহা হইতে আমরা আরও বুঝিতে পারিতেছি, কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির উপর আমাদের শুভাশুভ কতটা নির্ভর করিতেছে। এই উদ্দেশ্যেই আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ডলারের মূল্য প্রায় অর্দ্ধেক কমাইয়া দিয়াছেন। আমাদের আত্মকর্ত্তৃত্ব থাকিলে আমরাও হয়ত তাহাই করিতাম। ইহাতে অন্য দেশকে আঘাত করিয়া নিজ দেশের স্বার্থকেই হয়ত বড় করিয়া দেখা হইত। কিন্তু সে রকম দাবী

আজ আমরা করিতেছি না। ভুল করিয়া যেটুকু মূল্য বেশী ধরা হইয়াছে এবং যাহার জন্য আমরা অন্যায় রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি শুধু সেইটুকু হইতে আজ আমরা মুক্তি প্রার্থনা করি। আমাদের দরবার—২ পেনির দরবার।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এবং আরও দুই চারজন বাঙালী ছাড়া সারা ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে দ্বিমত নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হইবে না। অধ্যাপক সরকারের অভিমতে আমরা বিস্মিত হই নাই। সর্ব্ববাদিসম্মত সত্যে তিনি সাধারণতঃ আস্থাবান নহেন। তিনি নূতন সত্যের সন্ধানী। তাঁহার পক্ষে নূতন কিছু বলাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ব্যাপারে জনসম্মুখে আচার্য্য রায় মহাশয়ের মত লোকের অকস্মাৎ আবির্ভাবে আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। এ বিষয়ে তাঁহাকে আমরা অনধিকারী বলিতে চাহি না। কারণ সকল বিষয়েই তাঁহার পড়াশুনা এবং অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। তাই বলিয়া যাহারা আজীবন এক্সচেঞ্জ, ক্রেডিট, ফাইন্যান্স লইয়া কাটাইলেন; যাহারা ইহা অবলম্বন করিয়াই যা-কিছু প্রতিষ্ঠা ও সম্পদ জীবনে অর্জ্জন করিয়াছেন—তাঁহাদের এবং সকলের সমবেত অভিমতের বিরুদ্ধে এইরূপ উত্তেজনা ও উৎসাহ লইয়া তাঁহার এই আত্মপ্রকাশ অনেকটা হেঁয়ালির মত ঠেকিতেছে। তাঁহার এই রুদ্র মূর্ত্তি সম্বরণ করিবার জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে কিনা শেষে স্বস্তিবচন পাঠাইতে হইল।

উঁহাদের বিরুদ্ধ মতের প্রত্যুত্তর যোগ্য ব্যক্তিরা যথাসময়ে যথাস্থানে দিয়াছেন। তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। উচ্চ রেশিওর স্বপক্ষে সাধারণতঃ যে দুই তিনটি যুক্তি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে তাহাই সংক্ষেপে আমরা এখানে আলোচনা করিব।

আমরা দেখিয়াছি, বাট্টার হার উচ্চ হইলে বিদেশী জিনিষের দর সস্তা হয়। সুতরাং বাট্টার হার কমাইলে বিদেশী পণ্যের মূল্য চড়িয়া যাইবে, গরীব কৃষককুল ও জনসাধারণ এতটা সস্তায় আর জিনিষ কিনিতে পারিবে না, ইহা প্রতিপক্ষের একটি আপত্তি। কথাটা আপাততঃ বেশ ভাল শোনায়। কিন্তু গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়া যে রকম, কৃষকের ক্রয়শক্তি একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়া তারপর তাহার সম্মুখে সস্তা বিদেশী জিনিস উপস্থিত করাও প্রায় সেই রকম। যেখানে কেবল বাংলার কৃষকদের হাতে পূর্ব্বে ৯০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকিত, সেখানে তিন চার কোটি টাকাও আর আজ তাহাদের হাতে থাকে না। জিনিষের দর অসম্ভব রকম সস্তা হইলেও তাহারা আজ আর কিছু কিনিতে পারিতেছে না। বর্ত্তমান সমস্যার প্রধান লক্ষণই এই যে, পৃথিবীতে কোন জিনিষের আজ অভাব নাই, চারিদিকে কল্পনাতীত পণ্য-সম্ভারের আয়োজন, বিলাসসামগ্রীর ছড়াছড়ি; কিন্তু ক্রয় করিবার শক্তি আজ কাহারও আর তেমন নাই। Water, water, everywhere, but not a drop to drink. এই সস্তার হাটে আমাদের কৃষক বিদেশী সৌখীন বা প্রয়োজনীয় জিনিষ কিছু ক্রয় করিতে পারিতেছে কি? চড়াবাজারে সে যাহা কিনিতে পারিয়াছিল আজ তাহা ক্রয় করা তাহার কল্পনার অতীত।

এখানে আরও একটা কথা ভাবিবার আছে। সস্তা বিদেশী জিনিষের লোভে দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি এবং দেশের স্থায়ী মঙ্গলকে প্রতিহত করা উচিত কি না? অন্য কোন দেশ তাহা হইতে দেয় নাই। সেই জন্য তাহারা দিনের পর দিন শুল্কপ্রাচীর উচ্চতর, মুদ্রামূল্য ন্যূনতর করিয়া বিদেশী পণ্যের আমদানি প্রতিরোধ করিবার

মত্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। জাতিতে জাতিতে বিরোধ আজ সেই জন্য দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতিপক্ষের আর একটি যুক্তি এই, বাংলা শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে এক প্রকার নূতন ব্রতী, তাহার এই নবীন উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার সময় বস্ত্র, চিনি ও অন্যান্য কারখানার জন্য অনেক কলকব্জার প্রয়োজন। বাট্টার হার কমাইলে বিদেশ হইতে আমদানী কলকব্জা, যন্ত্রপাতির মূল্য চড়িয়া যাইবে। কয়টি কারখানার প্রয়োজনীয় কলকব্জার মূল্যের দরুণ আমাদিগকে যে টাকাটা অধিক দিতে হইবে, তাহার সহিত তুলনায় আমরা অন্তর ও বহির্বাণিজ্যের বিপুল উন্নতি হেতু যে টাকাটা পাইব, এই উভয়ের তুলনা করিলেই এই যুক্তির অসারতা বুঝিতে পারা যাইবে। যাঁহারা লক্ষ টাকা খরচ করিয়া কলকব্জা আনাইতে পারিবেন, তাঁহারা 'রেশিও'র ২ পেনি পার্থক্যের দরুণ শতকরা ১২॥০ হিসাবে † ১২৫০০৲ টাকাও বেশী দিতে পারিবেন। যদি ধরা যায় ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর নূতন ইন্‌ডাষ্ট্রীর জন্য এক কোটি টাকার কলকব্জা বিদেশ হইতে আমদানি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য আমাদিগকে ১২॥ লক্ষ টাকা অধিক দিতে হইবে। অথচ অন্য দিক দিয়া আমরা লাভবান হইব বহু কোটি টাকার।

তা ছাড়া এ সম্পর্কে আরও একটা দিক বিবেচনা করিবার আছে। বর্ত্তমান রেশিও যদি স্থির রাখা হয়, তাহা হইলে শুধু বিদেশী কলকব্জা কেন, বিদেশ হইতে আমদানি সব জিনিষের মূল্য শতকরা ১২॥০ টাকা কম পড়িবে। ফলে যন্ত্রপাতি সস্তা পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু ঐ যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রস্তুত পণ্যের মূল্য বিদেশী পণ্যের তুলনায় ১২॥০ টাকা

† ১০০ × ২ পেনি = ২০০ পেনি। ২০০ ÷ ১৬ = ১২॥০ টাকা।

শতকরা বেশী পড়িবে। একেকালীন কলকব্জার জন্য শতকরা ১২॥০ টাকা বেশী দেওয়া অপেক্ষা সেই কলকব্জা হইতে প্রস্তুত পণ্যের উপর দিনের পর দিন ১২॥০ টাকা বেশী দেওয়া নিশ্চয়ই অধিকতর ক্ষতিকর। মূল্যের এতটা পার্থক্যের দরুণ ভারতীয় পণ্য প্রতিযোগিতায় বাজারে টিকিয়া থাকিতেই পারিবে না এবং কারখানাটিও মূলেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

প্রতিপক্ষের তৃতীয় যুক্তিটি অধিকতর সারবান বলিয়া মনে হয়। বাট্টার হার ২ পেনি কমাইয়া দিলে ইংলণ্ডে 'হোম চার্জেস' দরুণ আমাদের বাৎসরিক যে দক্ষিণা দিতে হয় তাহা বৃদ্ধি পাইবে। দক্ষিণার পরিমাণ বাৎসরিক প্রায় ৩॥০ কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং অর্থাৎ প্রায় ৪৬২/৩ কোটি টাকা। টাকার মূল্য ২ পেনি হ্রাস পাইলে এই বাবদ আমাদিগকে শতকরা ১২॥০ হিসাবে আনুমানিক ৫২/৩ কোটি টাকা আরও বেশী দিতে হইবে ইহা সত্য। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতে কৃষকদের ঋণের পরিমাণ আনুমানিক ৮০০ কোটি টাকা। টাকার মূল্য ২ পেনি কমিলে তাহার ঋণভারও শতকরা ১২॥০ টাকা হিসাবে একশত কোটি টাকা লাঘব হইবে। কৃষিপ্রধান কৃষিসম্বল ভারতের হিতাহিত বিচার করিতে হইলে এই অসহায় মূক জীবদের কথা ভুলিলে চলিবে না। ইহা ছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হইবে, আয়কর, শুল্ককর ইত্যাদি বাবদ সরকারী আয় অনেক বৃদ্ধি পাইবে; সুতরাং 'হোম চার্জেস' বাবদ যে পাঁচ-ছয় কোটি টাকা আমাদিগকে অতিরিক্ত দিতে হইবে তাহা গায়ে লাগিবে না; বরং সাধারণ অবস্থার উন্নতির ফলে আমাদের মঙ্গলই হইবে।

ইংলণ্ডের নিকট আমাদের বহু টাকা ধার; যাহাকে ইংরাজীতে debtor country বলে আমাদের অবস্থাও তাই। বিদেশে মাল রপ্তানি

করিয়া তাহার মূল্য হইতে আমাদের দেনা পরিশোধ করিতে হয়। রপ্তানি পড়িয়া গিয়া বাণিজ্যের গতি যদি আমাদের প্রতিকূল দাঁড়ায়, তাহা হইলে ঋণ দিবার জন্য সঞ্চিত তহবিল ভাঙা ভিন্ন আমাদের আর অন্য উপায় থাকে না। সেই জন্যই গত কয়েক বৎসরে আমাদের দেশ হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া ২৫০ কোটি টাকার স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং এখনও যাইতেছে। কিন্তু এ ভাবে কতদিন চলিবে? তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্যবস্থা পরিষদে রাজস্বসচিব যখন নূতন বিল উপস্থিত করিলেন, তখন ১ শিলিং ৬ পেনি স্থলে ১ শিলিং ৪ পেনি বেশিও নির্দ্ধারণ জন্য পুনরায় আন্দোলন সুরু হয়। অন্ততঃ বর্ত্তমান বেশিও ঐ বিলে কায়েম না করিয়া দেশের অবস্থানুযায়ী মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার ঐ ব্যাঙ্কের উপর দেওয়া হউক, ইহাও অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই; রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া ষ্টার্লিং ও টাকার বেশিও পূর্ব্ববৎ ১ শিলিং ৬ পেনি পাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন দেশের মুদ্রার মূল্য এভাবে পাকাপাকি করিয়া বাঁধা নাই। আর্থিক জগতের কতকগুলি অবস্থার উপর তাহা কমিতেছে বাড়িতেছে। আমরা দেখিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে মুদ্রা মূল্য হ্রাস করিবার প্রবল চেষ্টা দেশে দেশে চলিয়াছে এবং প্রত্যহ ডলার, ষ্টার্লিং, ইয়েন প্রভৃতি মুদ্রার বেশিও স্বাভাবিক নিয়মে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কেবল আমরাই আইনের নাগপাশে বাঁধা পড়িয়াছি। এই বাঁধন হইতে ছাড়া পাইলেই আমাদের টাকার স্বাভাবিক ও প্রকৃত মূল্য ধরা পড়িত। কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই; কারণ মা'র চেয়ে মাসীর দরদ বেশী।

বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু আর্থিক জগতে যে দুর্দ্দৈব দেখা দিয়াছে তাহা কাটিবার কোন লক্ষণই বিশেষ দেখা যাইতেছে না। কোথা হইতে কি করিয়া এই বিশ্বব্যাপী অনর্থের স্ত্রপাত হইল তাহা কেহই বড় ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না; কিন্তু অসীম ধৈর্য্যের সহিত আশা করিয়া আছেন, স্বর্গের কিংবা মর্ত্ত্যের অধিপতিরা শীঘ্রই ইহার একটা প্রতিকার করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, মর্ত্ত্যের দেবতারাও হালে পানি পাইতেছেন না, স্বর্গের দেবতারাও বিমুখ। বিকল যন্ত্রটাকে লইয়া নানারূপ কারসাজি চলিয়াছে, মাঝে মাঝে যন্ত্রটা একটু নড়িয়া-চড়িয়াও উঠিতেছে, কিন্তু তার প্রাণের স্পন্দন বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতেছে না। মানুষের দুঃখ যখন দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে তখন তাহা লইয়া নিজেদের মধ্যে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেও সাময়িক আত্মবিস্মৃতি ঘটিতে পারে।

রোগের কারণ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত হইলেও একথা ঠিক যে পূর্ব্বকালে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে খাদ্যশস্য ধ্বংস হইয়া যে অভাব-অনটন বা দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইত, ইহা তাহা নহে। প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব হইতে এই সঙ্কটের উদ্ভব হয় নাই। মানুষের নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা বা সংগঠনশক্তি যে অপূর্ব্ব শিল্পসম্ভারের জন্মদান করিয়াছে, তাহার অভাব হইতেও এই সমস্যার সৃষ্টি হয় নাই। এ সঙ্কট বস্তুজগতে প্রাচুর্য্যের সঙ্কট—অভাবের সঙ্কট নহে। তবে কি বুঝিতে হইবে সমগ্র পৃথিবীর অভাব আজ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে? মানব মাত্রেরই কোন পার্থিব আকাঙ্ক্ষা আজ আর

অপূর্ণ নাই—ভোগ তাহার আজ আকণ্ঠ হইয়াছে? তাহাও ত সত্য নহে। প্রকৃতির দানে কার্পণ্য ঘটে নাই, মানুষের সৃষ্টি তেমনি অবিরাম চলিয়াছে ইহা যেমন সত্য, সকল রকমে বঞ্চিত নিঃস্বের অসদ্ভাবও পৃথিবীতে কিছু মাত্র ঘটে নাই, ইহাও তেমনই সত্য। বিশ্ব-অধিবাসীর এক পঞ্চমাংশ ভারতীয়দের দিকে তাকাইলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এক জন ইংরেজ পণ্ডিত বলিয়াছেন—"Human demand is illimitable and will be, untill the last Hottentot lives like a millionaire." "মানুষের চাহিদা অসীম, এবং যতদিন পর্য্যন্ত না শেষ হটেণ্টট ক্রোড়পতির মত চালে জীবন যাপন করে, ততদিন অসীম থাকিবে।"

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, মানুষের অভাব পূর্ণ হয় নাই এবং অকস্মাৎ স্বর্গরাজ্যের আবির্ভাব না হইলে, সে অভাব পূরণ হইতে এখনও সম্ভবতঃ বহু যুগের আবশ্যক। অথচ অন্য দিকে পণ্যসম্ভার আজ শিল্পী ও বণিকের কাঁধে ভূতের বোঝা হইয়া চাপিয়া বসিয়াছে—মানুষের ভোগে তাহা আসিতে পারিতেছে না। ভোজ্য প্রচুর, বুভুক্ষুও সংখ্যাতীত। বুঝিতে পারা যাইতেছে কোন কারণে দুইয়ের যোগসূত্রের বিচ্ছেদেই এই প্রাণান্তকর নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে। যে ব্যবস্থা ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি ও স্বার্থ মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উভয়ের যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাহার ভিতরে কোন ছিদ্রপথে আজ ঘুণ ধরিয়াছে।

সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হইতে পারে উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ বর্ত্তমান সময়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু হিসাব লইলে দেখা যাইবে ১৯২৯ সালের পর এই দুর্দ্দিনের সুরু হইতে, পণ্য ও শিল্পের উৎপাদন

পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। উহাদের মূল্যও অত্যধিক হ্রাস পাইয়াছে; অথচ পৃথিবীর লোকসংখ্যা ও বিবিধ জিনিষের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইয়াছে ভিন্ন হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উৎপন্ন পণ্যের আধিক্য হেতু এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, আমাদের এই অনুমান ঠিক নহে বুঝিতে হইবে।

কাঁচা মাল বা তৈরী জিনিষ, কাহারও আজ আর যথেষ্ট চাহিদা নাই, ইহাই হইল বর্ত্তমান দুর্গতির গোড়ার কথা। ইহার মূলে রহিয়াছে যে মূল্যে ক্রেতাগণ ক্রয় করিতে সমর্থ এবং যে-মূল্যে বিক্রেতা ক্ষতি স্বীকার না করিয়া বিক্রয় করিতে সমর্থ, এই দুই ক্ষমতার তারতম্য। কোন জিনিষের প্রয়োজন থাকা ও বাজারে তাহার চাহিদা থাকা এক জিনিষ নহে। প্রয়োজন বা সখ আমাদের বহু জিনিষেরই আছে, কিন্তু তাই বলিয়া সব প্রয়োজন বা সখ মিটাইবার শক্তি আমাদের সকলের আছে কি? প্রয়োজন তখনই চাহিদায় পরিণত হয় যখন মূল্যদ্বারা প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করিবার শক্তি আমরা অর্জ্জন করি। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জিনিষের চাহিদা নির্ভর করে দুইটি জিনিষের উপর—প্রথমতঃ, তাহার প্রয়োজনীয়তা; দ্বিতীয়তঃ, তাহার মূল্য। মানুষের প্রয়োজন ও পছন্দ সম্বন্ধে কারখানার মালিক যদি ঠিক অনুমান করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পণ্যদ্রব্য লইয়া যেমন গুরুতর অবস্থায় পড়িতে হইবে, অর্থনীতির মারপ্যাঁচে জিনিষের মূল্যহ্রাস ঘটিলেও তাঁহাকে তেমনি বিব্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। অর্থনীতির সহিত মূল্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে এখানে আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাক। অর্থের পরিমাণ বিভিন্ন দেশের অর্থ-নৈতিক ও অন্যান্য নানা কারণে কমিতেছে বাড়িতেছে। কোন দেশে চলতি অর্থের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ অর্থসমষ্টির সঙ্কোচন (deflation) ঘটিলে,

জোগান ও চাহিদার সাধারণ নিয়মানুযায়ী অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে; অর্থাৎ জিনিষের মূল্য হ্রাস পাইবে। পক্ষান্তরে, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (inflation) হইলে অর্থের মূল্য কমিবে অর্থাৎ জিনিষের মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

অনেকে মনে করেন পণ্যবিনিময়ের বা বেচাকেনার ক্ষেত্রে মুদ্রার আবির্ভাব এবং একাধিপত্য এই গুরুতর সমস্যার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী। সেই জন্য একদল নূতন পন্থী পণ্যের হাট হইতে এই খামখেয়ালি মধ্যবর্ত্তী প্রভুটিকে বাদ দিয়া পণ্যের সহিত পণ্যের সাক্ষাৎ বিনিময় পুনঃপ্রবর্ত্তন করিয়া আদিকালের ব্যবস্থাকে ফিরাইয়া আনিতে চাহেন। বিভিন্ন দেশের মুদ্রানীতি বর্ত্তমান সমস্যাকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা অন্যান্য কারণগুলির অনুসন্ধান করিতে চাই।

দেহরক্ষা ও প্রাণধারণের উপযোগী নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়টি জিনিষ বাদ দিলে সুখস্বচ্ছন্দতা বা আরামের জন্য আজ মানুষের যে অসংখ্য প্রকার বিলাস-সামগ্রীর প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তির দ্রুত উন্নতির ফলে একই শ্রেণীর জিনিষ নিত্য নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্রেতাদিগকে বিভ্রান্ত ও বহুবিভক্ত করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের পছন্দ বা সখের আজ আর অন্ত নাই। হালফ্যাশানরূপে আজ যাহা সাগ্রহে গৃহীত হইতেছে, কাল তাহা পুরাতন ও সেকেলে হিসাবে পরিত্যক্ত হইতেছে। অস্থিরমতি ক্রেতার এই দৌরাত্ম্য বর্ত্তমান যুগের কারখানার মালিকগণের পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে কারিকরদের সংখ্যা ছিল বহু ও বিস্তৃত এবং শক্তি ছিল কম। বাজারের অবস্থা বুঝিয়া নিজ নিজ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা তাহারা সহজেই সময়োপযোগী করিয়া লইতে পারিত।

এক্ষণে এক একটি জিনিষ প্রস্তুতের জন্য এক একটি বিশাল যৌথকারবারের সৃষ্টি হইয়াছে; তাহার বিরাট আয়োজন। একই ছাঁদে একই জিনিষ তাহার উদর হইতে বাহির হইতেছে শতে শতে বা সহস্রে সহস্রে। নূতন ফ্যাশন, নূতন গড়ন একটি চলতি জিনিষকে বাতিল করিয়া দিলে, নূতন অবস্থার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়ান এই সব বৃহৎ পাকা ইমারত ও ঢালাই লৌহ-ইস্পাতের পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় সহজসাধ্য হয় না। ব্যবসাক্ষেত্রে এমনি একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহাতে একটা বড় কারখানার অবস্থা কাহিল হইলে তাহার প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। বাংলার চাষীর অবস্থা হীন হওয়ায় তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় বস্ত্রাদি ক্রয় করিতে পারিতেছে না এবং ফলে বিলাতি ও দেশী কাপড়ের কলের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। এখানেই শেষ নহে—কলওয়ালাদের তুলার প্রয়োজন পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় ভারতের ও আমেরিকার তুলার ব্যবসায়ীর অবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বল হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, কাপড়ের কলের কারিকর ও মজুরদের অবস্থা হীন হওয়ায় খরচ সম্বন্ধে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে হাত গুটাইতে হইয়াছে। ফলে যে-সব ব্যবসায়ী তাহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া লাভবান হইতেছিল তাহাদের ব্যবসায় ভাটা পড়িতে সুরু করিয়াছে। এক মাত্র পাটের মূল্য হ্রাস হইতে যে অবস্থার প্রথম সূচনা হইয়াছিল তাহার শেষ পরিণতি কোথায় তাহা বলা কঠিন। এক স্থানের জের আজ সারা দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। কারণ দেশকালের ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়া সারা দুনিয়া আজ এক হাটে মিলিয়াছে। ব্যবসা-জগতে একের অন্যকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া চলিবার উপায় আর নাই।

বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটকে অনেকেই ট্রেড সাইকেল (trade cycle) এরই একটা সাধারণ পর্য্যায় মাত্র মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে ধারণা এতদিনে ঘুচিয়াছে। অবশ্য একথা কেহ অস্বীকার করেন না যে, ব্যবসাজগতেরও একটা ভাগ্যচক্র আছে এবং তাহা পর্য্যায়ক্রমে উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে। উন্নতির পর অবনতি এখানকারও স্বাভাবিক নিয়ম। কোন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি ও অর্থাগম আরম্ভ হইলেই ব্যবসায়িগণ অধিক লাভের আশায় অতিরিক্ত মাল প্রস্তুত করিয়া বাজারে ছাড়িতে সুরু করেন; ফলে মূল্য হ্রাস ও লাভের ঘরে শূন্য পড়িতে থাকে এবং নূতন ব্যবসা-বাণিজ্য পত্তন ও অর্থব্যয়ের সব পথ রুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। এইরূপ অবস্থা আসিলে অবিক্রীত মাল যে-কোন মূল্যে ছাড়িয়া দেওয়া ভিন্ন উপায় থাকে না। তখন আবার জিনিষের চাহিদা স্বল্পমূল্যতার দরুন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া ব্যবসা-জগতে নূতন প্রাণ সঞ্চারের সৃষ্টি করে। ইহারই নাম ট্রেড সাইকেল। কতকগুলি লোকের দূরদর্শিতার অভাব, উৎপন্ন পণ্যের আধিক্য, ইত্যাদি সাধারণ কারণে মাঝে মাঝে এরূপ অবসাদ ব্যবসা-জগতে আসিয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান অবসাদের গুরুত্ব ও বিস্তৃতি যেমন অননুভূতপূর্ব, ইহার বৈশিষ্ট্যও তেমনই অসাধারণ; কারণ পণ্যের অভাবনীয়রূপ মূল্যহ্রাস সত্ত্বেও বিশ্বের হাটে মালের চাহিদা তেমন বাড়িতে পারিতেছে না।

অনেকে মনে করেন অর্থনৈতিক ও বিগত যুদ্ধঘটিত কারণ ব্যতিরেকেও কৃষিজাত পণ্যের মূল্য ও কৃষকের অবস্থার অধোগতি অনিবার্য্য ছিল। শিল্পজাত পণ্যের প্রয়োজনীয়তার শেষ নাই সত্য; কিন্তু কৃষিজাত পণ্য সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য নহে; কারণ মানুষের হজম শক্তির একটা সীমা আছে; তাই ভোজনের রকমারি বৃদ্ধি পাইলেও প্রত্যেক জিনিষের

পরিমাণ কমিয়াছে। যানবাহন ও চাষাবাদের জন্য গরু ও ঘোড়ার স্থান মোটর অধিকার করায় গরু ঘোড়ার জন্য যে পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক হইত তাহারও আর প্রয়োজন হইতেছে না। কিন্তু অধুনা বিজ্ঞানের কল্যাণে ভাল সার ও উন্নত প্রণালীতে চাষ-আবাদ হইয়া প্রতি একরে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সব কারণে অনেকে মনে করেন সর্ব্বক্ষেত্রে আজ যে অবসাদ দেখা যাইতেছে তাহার গোড়ায় রহিয়াছে কৃষি ও কৃষকের দুরবস্থা। সেখান হইতেই বর্ত্তমান দুর্গতির সূত্রপাত।

তার উপর বিগত লড়াই চারিদিকে বাধানিষেধের সৃষ্টি করিয়া মাল-সরবরাহের সাধারণ ব্যবস্থাকে একেবারে ওলট-পালট করিয়া দেয়। যুদ্ধে নিরত দেশসমূহ বিভিন্ন দেশে খাদ্যশস্য বা সেই সময়কার প্রয়োজনীয় সকল জিনিসের রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেয়। অন্যদিকে অবরোধ (blockade) নীতিও চলিতে থাকে। রুশিয়ার গম বাহিরে যাইতে না পাবায় আমেরিকা তাহারা গমের চাষ এই সুযোগে খুব বৃদ্ধি করিয়া ফেলে। যুদ্ধের অবসানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে দেখা যায়, পৃথিবীর প্রয়োজন অপেক্ষা গমের সরবরাহ অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ এবং জাপান লড়াইয়ের সময়ে তাহাদের কাপড়ের কল যথাসাধ্য বাড়াইয়া ফেলিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের বাজার অধিকার করিয়া ফেলিল। লড়াই অন্তে ল্যাঙ্কাশায়ারের কল যখন পুনরায় পুরা দমে চলিতে সুরু করিল, তখন সকল কলওয়ালারই হইল ফ্যাসাদ। যুদ্ধের সময় জিনিষের আমদানি বা রপ্তানি কষ্টসাধ্য হওয়ায় প্রত্যেক দেশই নিজ নিজ প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরি ও সরবরাহের ব্যবস্থা নিজ দেশের মধ্যেই করিয়া লইতে বাধ্য হয়। কাজেই যুদ্ধশেষে আমদানি-রপ্তানি পুনরায় আরম্ভ হইলে জিনিষের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইতে থাকে। আয়োজনের

সহিত প্রয়োজনের, কৃষির সহিত শিল্পের এই আকস্মিক বৈষম্য বিগত যুদ্ধেরই অপর পরিণাম এবং ব্যবসা-বাণিজ্যকে পঙ্গু করিবার অন্যতম কারণ।

এই ত গেল পণ্যের যোগান ও চাহিদা সম্পর্কীয় সমস্যা—একের অদূরদর্শিতা ও অব্যবস্থা; অপরের খামখেয়ালি। যোগান ও চাহিদার মধ্যে যে জিনিষটি সার পদার্থ, মধ্যস্থ হইয়া যিনি উভয়ের সংযোগ সংঘটন করেন, সেই সকল অনর্থের গোড়া অর্থ সম্বন্ধে এক্ষণে আমরা আর একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব। আমাকে স্থির চিত্তে কাজ করিতে হইলে আমার পূর্ব্বাহ্নে জানা দরকার, যে-মধ্যস্থ মাপকাঠির সাহায্যে আমার পণ্যের দর নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহার মাপ বা মূল্য ঠিক আছে এবং ভবিষ্যতেও ঠিক থাকিবে। যোল গিরার মাপে গজ হিসাব করিয়া পাইকারী দরে কলিকাতা হইতে কাপড় কিনিয়া আনিলাম পল্লীর হাটে খুচরা বিক্রয় করিয়া লাভবান হইব। কিন্তু মাল পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গে গজের মাপ যদি যোল গিরার স্থলে বত্রিশ গিরা নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে লাভের ঘরে আমাকে নিশ্চয়ই সর্ষেফুল দেখিতে হয়। যে অর্থকে মধ্যস্থ রাখিয়া আমরা বেচাকেনার কাজ করি, লাভ ক্ষতি নির্ণয় করি, তাহার মূল্যই যদি পরিবর্ত্তনশীল হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বলিতে হয়, "বল্ মা তারা, দাঁড়াই কোথা?" অর্থ বলিতে আধুনিক যুগে আমরা শুধু রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রা বুঝিব না; কারেন্সি নোট, চেক, ড্রাফ্ট্, বিল, মায় ধার করিবার মর্য্যাদা (যাহাকে ইংরাজিতে ক্রেডিট বলা হয়) এই সবই আজ অর্থপর্য্যায়ভুক্ত। আমার হাতে টাকা নাই, কিন্তু বাজারে মর্য্যাদা (credit) আছে। আমি লক্ষ টাকার মাল ধারে ক্রয় করিতে পারি। এখানে অর্থের প্রয়োজন আমি নিজ প্রতিপত্তির দ্বারা মিটাইয়া লইতে সমর্থ হইতেছি। লক্ষ টাকা পুঁজি

লইয়া দু-চার লক্ষ টাকার কারবার হরদম্ চলিয়াছে বর্ত্তমান দুনিয়ায়। তাই অর্থশাস্ত্রে ক্রেডিটও আজ টাকার মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। এই ক্রেডিটের পরিমাপ করা চলে না। এই সব কারণে দেশবিশেষের বা দুনিয়ার অর্থের পরিমাণ একেবারেই স্থির রাখিতে পারা যাইতেছে না। শুধু ধাতব মুদ্রা ও গবর্ণমেণ্ট-প্রচলিত নোট ভিন্ন অর্থের প্রয়োজন অন্য কোন ভাবে মিটাইবার উপায় না থাকিলে এবং বহির্জগতের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যাদি সকল প্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারিলে, কোন দেশের অর্থের পরিমাণ হয়ত অনেকটা স্থির রাখিতে পারা যাইত। কিন্তু বিশ্বের হাট আজ ঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের কাছে তাহার দিবার ও নিবার আহ্বান আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার মূল্য যেমন পাইতেছি তেমনি দিতেছি। এই সব আন্তর্জ্জাতিক লেনাদেনার ভিতর দিয়া দেশের অর্থভাণ্ডার অবিরত বাড়িতেছে কমিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের মূল্যও স্থির থাকিতেছে না। আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। ধরা যাক, বাজারে পাঁচটি রোহিত মৎস্য আসিয়াছে; এবং সমবেত ক্রেতাদের পকেটে মোট পঁচিশটি টাকা আছে। এ অবস্থায় একটি মাছের দর ৫৲ টাকার বেশী হইবার উপায় নাই। মৎস্য-ব্যবসায়ীকে অগত্যা এই মূল্যেই তাহার মাছ বিক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু ২৫৲ টাকার স্থলে যদি হাটের ক্রেতাদের নিকট ৩০৲ টাকা থাকিত, তাহা হইলে ৬৲ টাকা দরেও মাছগুলি বিক্রয় হইতে পারিত। পক্ষান্তরে ক্রেতাদের নিকট ২০৲ টাকার বেশী না থাকিলে বিক্রেতাকে ৪৲ টাকা মূল্যেই মাছগুলি বাধ্য হইয়া বিক্রয় করিতে হইত। টাকার পরিমাণের উপর জিনিষের দর কি ভাবে নির্ভর করে ইহা হইতে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারিব।

অর্থনীতির মারপ্যাচ ব্যতিরেকেও জিনিষের মূল্য যে হ্রাসবৃদ্ধি পাইতে

পারে এখানে সে কথাটাও আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক। এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধির সহিত অবশ্য বর্ত্তমান সমস্যার কোনরূপ যোগাযোগ নাই এবং ইহা অন্যায় রকমে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতিও করে না। শিল্পীর চেষ্টা ও বিবেচনার ফলে কোন পণ্য প্রস্তুত করিবার ব্যয় হ্রাস পাইতে পারে; কোন নূতন আবিষ্কারের কল্যাণে শ্রমের লাঘব হইয়াও খরচের সাশ্রয় হইতে পারে। বুদ্ধি বা কর্ম্মের যোগ্যতার দরুন এইরূপ মূল্য-হ্রাস ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে অনিষ্টকর ত নহেই, বরঞ্চ স্বাস্থ্যকর—কারণ, অর্থের মূল্য বা ক্রয়শক্তির নড়চড় না হইয়া জিনিষের মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে স্বাভাবিক নিয়মে তাহার চাহিদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। শিল্পোন্নতির ইহাই সত্যকার পরীক্ষা। এ-ভাবে মূল্য-হ্রাস জিনিষ-বিশেষের ক্ষেত্রেই ঘটিতে পারে—সকল জিনিষের বেলায় কখনও এভাবে একসঙ্গে মূল্য-হ্রাস সম্ভবপর নহে কিন্তু বর্ত্তমান সমস্যার মূলে জিনিষ মাত্রেরই অসম্ভব রকমের মূল্য-হ্রাস আমরা দেখিতে পাই। ইহা উল্লিখিত যোগ্যতার স্বাভাবিক পুরস্কার নহে, অর্থনৈতিক কারণের অস্বাভাবিক পরিণাম। ইহার মূলে রহিয়াছে পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কোচন বা currency deflation. এখানে ইহাও উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ভূয়োদর্শিতা ও যোগ্যতা দ্বারা জিনিষের তৈরি-খরচ কমাইয়া কোনই লাভ নাই—যদি মুদ্রা-মূল্য আমরা স্থির রাখিতে না পারি। কারণ মুদ্রা-মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হইলে জিনিষের দর আপনিই চড়িয়া যাইবে এবং কারিকর তাহার যোগ্যতার ন্যায্য পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হইবে।

লড়াইয়ের জীবন-মরণ সমস্যার সময় অর্থের প্রয়োজন হইল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। স্বর্ণমুদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সকলে নিজ নিজ দেশে অত্যধিক পরিমাণে কাগজের নোট চালাইতে সুরু করিলেন। তারপর লক্ষ লক্ষ টাকার কাজকর্ম্ম নিজেদের মধ্যে ধারে চলিতে লাগিল। এইরূপে

পৃথিবীর অর্থ-তহবিলকে অস্বাভাবিকরূপে জোর করিয়া অত্যন্ত ফাঁপাইয়া তোলা হইল। ফলে লড়াইয়ের সময় জিনিসের দর কল্পনাতীত বৃদ্ধি পাইয়া গেল। কিন্তু যুদ্ধ-শেষে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে সকল দেশই যখন স্বর্ণমান পুনরায় প্রচলন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সকল জিনিসের মূল্যের উপরই হঠাৎ একটা গুরুতর চাপ পড়িল। ঘোর দুর্দ্দিনে যে 'মেকি' মুদ্রা ও মর্য্যাদাকে একপ্রকার জোর করিয়া চালান হইয়াছিল তাহা বাতিল হইয়া গেল এবং মুদ্রা-তহবিলের স্ফীতি অকস্মাৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হইল—সঙ্গে সঙ্গে জিনিসের দরও চারিদিকে একেবারে পড়িয়া গেল। বর্ত্তমান ব্যবসামন্দার মূলে মুদ্রানীতির অদৃশ্য হস্ত যে অনেকখানি দায়ী তৎসম্বন্ধে আর ভুল নাই। নরমেধ-যজ্ঞের উদযাপন সফল করিবার জন্য যাঁহারা ভুয়া অর্থ সৃষ্টি করিয়া মানুষের অর্থ-লালসাকে অসম্ভব রকম বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন, যুদ্ধের শেষে এক কলমের খোঁচায় তাঁহারা সেই 'মেকি' অর্থের অন্তর্দ্ধান ঘটাইলেন বটে, কিন্তু মানুষের দুরাশাকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। কারিকর, মজুর হইতে সুরু করিয়া উপরওয়ালা সকলেই লড়াইয়ের সময়কার মজুরী ও লাভ দাবি করিতে ছাড়িলেন না; কিন্তু সেই দাবি মিটাইবার জন্য তহবিলে আর তখন অর্থ নাই। জিনিসের তৈরি খরচ কমিতে চাহিল না, অথচ ক্রেতার ক্রয়শক্তি হ্রাস পাইয়া গেল। উভয়ের মধ্যে বৈষম্যের ইহাও অন্যতম প্রধান কারণ।

অর্থশাস্ত্রের সঙ্কোচন বা প্রসারণ নীতির ফলে মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইলে আর্থিক জগতে তাহার অপর কি পরিণাম হইতে পারে তৎসম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতে পারে। রামের নিকট আমি যখন টাকা ধার করি তখন টাকার যে মূল্য বা ক্রয়শক্তি ছিল এক্ষণে তাহা যদি কমিয়া অর্দ্ধেক হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে আমার

দেনা আপনা হইতে অর্দ্ধেক হ্রাস পাইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। কি প্রকারে, বলিতেছি। ধরা যাক্—আমি যখন টাকা ধার করিয়াছিলাম, তখন এক মণ চালের দর ছিল ৫৲ টাকা। এক্ষণে টাকার ক্রয়শক্তি অর্দ্ধেক হ্রাস পাইয়া সকল জিনিষের মূল্যই দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এক মণ চালের মূল্য ১০৲ টাকা এবং আধ মণ চালের মূল্য ৫৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। যে ৫৲ টাকা ধার করিয়া আমি এক মণ চাল কিনিয়াছিলাম, সেই ৫৲ টাকা যখন বন্ধুকে আমি ফিরাইয়া দিলাম, তখন তিনি তাহা দ্বারা আধ মণের বেশী চাল আর খরিদ করিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে তাঁহার অর্দ্ধেক টাকা হাওয়ায় উড়িয়া গিয়া তাঁহার দেনদারের পকেটে আশ্রয় লইয়াছে। মানুষের টাকার প্রয়োজন টাকার জন্য নহে, তাহার সাহায্যে তাহার অন্য প্রয়োজন মিটাইবার জন্য। কর্ম্মক্ষেত্রে বা ব্যবসাক্ষেত্রে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক দেনা-পাওনা লইয়া। অপরের নিকট আমার যেমন টাকা প্রাপ্য আছে তেমনই আবার অপরেও আমার নিকট টাকা পাইবে। কিন্তু মুদ্রা-মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে এই দেনা-পাওনা স্থির থাকে না এবং নিতান্ত অকারণে একজনের পাওনা বাড়িয়া দেনা কমিয়া যায় কিংবা দেনা বাড়িয়া পাওনা কমিয়া যায়। এইরূপে অর্থ যখন অন্যায় রকমে হাত বদলায় তখন নূতন ধনী নূতন পছন্দ ও নূতন দাবি লইয়া বাজারে উপস্থিত হয় এবং দোকানদার তাহার পুরাতন অভিজ্ঞতা ও আয়োজন লইয়া একেবারে বোকা বনিয়া যায়। ইহাও ব্যবসাজগতে বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ মনে করা যাইতে পারে।

একটি দুর্গতি অপর দুর্গতিকে আহ্বান করিয়া আনে; দেহের একটি অংশ বিকল হইলে তাহার অপর অংশও ধীরে ধীরে আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। জিনিষের কাটতি পড়িয়া গিয়া

ব্যবসা মন্দার সৃষ্টি হইতেই মানুষের মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। দোকানে বা গুদামে মাল পড়িয়া আছে, কিন্তু হাতে অর্থ নাই। কাজেই মহাজন তাহার পাওনার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং ধারে কাজ করিতে কেহই আর ভরসা পাইতেছে না। চারিদিকে কেমন একটা অবিশ্বাস ও অনাস্থা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যাহার কিছু টাকা আছে তিনি সে টাকা আর হাতছাড়া করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহাতে নূতন ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হইয়া বেকার-সমস্যার গুরুত্ব যেমন বাড়িতেছে, কেনাবেচা আরও কমিয়া গিয়া চলতি ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থাও আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। অন্য সব-কিছুতে আস্থা হারাইয়া লোকে শুধু নগদ টাকা পুঁজি করিতে ব্যস্ত হইয়াছে এবং এই মনোবৃত্তি ব্যক্তিবিশেষকে ছাড়াইয়া প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্টের মধ্যে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইয়াছে। ফলে প্রত্যেক গভর্ণ-মেণ্টই বিদেশে মাল চালান করিয়া নিজ দেশে অর্থাগমের জন্য যেমন এক দিকে ব্যস্ত, অন্য দিকে বিদেশ হইতে মাল আমদানি হইয়া দেশের অর্থ যাহাতে বাহিরে চলিয়া যাইতে না-পারে তাহার জন্যও তেমনই উৎকণ্ঠিত। আপাতদৃষ্টিতে ইহা ভালই মনে হইতে পারে। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের যুগে প্রত্যেক দেশই যদি এই পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসাই বা চলিবে কিরূপে? আর যে উদ্দেশ্যে এই পথ অবলম্বন করা তাহাই বা সিদ্ধ হইবে কেমন করিয়া? যেখানে সব সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, সেখানে এ-পথ যে আত্মরক্ষার পথ নহে, এ-পথে পরের যাত্রা ভঙ্গ হইলেও নিজের নাককানও যে আস্ত থাকিবে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

অপরের ব্যবসা নষ্ট করিয়া নিজের ব্যবসা প্রসারের এই ব্যর্থ চেষ্টা চলে দুই উপায়ে। প্রথমতঃ, বিদেশী জিনিষের উপর উচ্চ শুল্ক বসাইয়া

উহার প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা ; দ্বিতীয়তঃ, স্বদেশের কারখানাকে অর্থসাহায্য করিয়া অর্থাৎ subsidy দিয়া নিজেদের অক্ষম প্রচেষ্টাকে বিদেশী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার চেষ্টা। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক প্রগতি ব্যাহত হইয়াছে। উচ্চ শুল্ক-প্রাচীরের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য যদি আজ অচল হইয়া থাকে তবে তাহার জন্য বিধাতাপুরুষকে দোষ দিলে তিনি তাহার জবাব দিবেন না সত্য ; কিন্তু এ অবস্থা হইতে মুক্তিও আমাদের মিলিবে না।

বর্ত্তমান অবস্থার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী এবং বিগত লড়াইয়ের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লিষ্ট দুইটি কারণ এখনও আমাদের উল্লেখ করা হয় নাই। তাহা হইতেছে—সমরঋণ ও বিজিত দেশসমূহের উপর ক্ষতিপূরণের দাবি। এই দুই দাবি একত্র করিলে এক শত কোটি টাকার উপর প্রতি বৎসরে অধমর্ণদের দেয়। এই টাকাটার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আমেরিকার এবং অবশিষ্ট ফ্রান্সের প্রাপ্য। বিশ্বের হাট হইতে প্রতি বৎসর এতগুলি স্বর্ণমুদ্রা অপসৃত হইয়া দুইটি দেশের অর্থভাণ্ডারে সঞ্চিত হইতে থাকিলে এবং অধমর্ণ দেশসমূহ এতগুলি অর্থের সদ্ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হইলে, তাহার পরিণাম ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে কিরূপ ক্ষতিকর হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। এতগুলি টাকা ঋণপরিশোধের জন্য ব্যয় হওয়ার অর্থ, ঐ পরিমাণ মূল্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের হানি হওয়া। যাহাদের ভাণ্ডারে টাকা যাইতেছে তাঁহারা যদি উহা সঞ্চয় না করিয়া উদার ভাবে ব্যয় করিতেন, তাহা হইলেও এতটা ক্ষতি হইত না। কিন্তু তাঁহারা উহা ব্যয় না করিয়া উহা দ্বারা নিজ নিজ স্বর্ণ-তহবিল স্ফীত করিয়া চলিয়াছেন। নগদ মুদ্রা না লইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা যদি অধমর্ণদিগের

নিকট হইতে ঐ মূল্যের প্রয়োজনীয় পণ্য গ্রহণ করিতেও স্বীকৃত হইতেন তাহা হইলেও হতভাগ্য অধমর্ণদের বাঁচিবার উপায় হইত। কিন্তু তাহা ত হইবার উপায় নাই ; অধিকন্তু অধমর্ণের দেশ ও অন্যান্য দেশ হইতে পণ্যের আমদানি বন্ধ করিবার সব ব্যবস্থাই বিধিমত ঠিক আছে। নিরুপায় হইয়া দেনদার দেশসমূহ দেশের টাকা যথাসম্ভব বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে বিদেশী মালের আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং ঋণপরিশোধের জন্য যে-কোন মূল্যে বিদেশে মাল বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, পুনরায় স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ দেশের মুদ্রা-মূল্য হ্রাস করতঃ বিদেশে নিজ মাল সস্তায় চালাইবার প্রতি-যোগিতা চলিয়াছে।* ফলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য অধিকতর বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, জিনিষের চাহিদা ও মূল্য আরও হ্রাস পাইয়াছে। মুদ্রা-মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে দেনাদারের দেনার পরিমাণও আপনা হইতে বাড়িয়া চলিয়াছে। এতগুলি দেশকে পঙ্গু করিয়া শুধু একা সুখী ও লাভবান হওয়া বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের যুগে সম্ভবপর নহে। তাই আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশও বড় সুখে নাই।

এই যে নিজ হাতে তৈরি গোলকধাঁধার মধ্যে সভ্যতাভিমানী মানবজাতি চোখে ঠুলিবাঁধা জন্তুবিশেষের মত ঘুরিয়া মরিতেছে, এই অবস্থার প্রতিকার কি? বিচার-বুদ্ধির দ্বারা ইহার একটা মীমাংসা হয়ত তেমন কঠিন নহে ; কিন্তু মীমাংসাকে কার্য্যে পরিণত করাই দুরূহ। পরস্পর-সংশ্লিষ্ট এই আন্তর্জ্জাতিক ব্যাধির প্রতিকার করিতে হইলে প্রথমেই উগ্র জাতীয়তাবাদের মূলোচ্ছেদ করা আবশ্যক। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও ক্ষমতা যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার মনুষ্যত্ব, মানবপ্রীতি

---

* "স্বর্ণমান" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ও ধর্ম্মভাব সে হাবে বৃদ্ধি পায় নাই। মনীষা দ্বারা যে অদ্ভুত সৃষ্টি সে নিজ হাতে গড়িয়া তুলিয়াছে, হৃদয়ের উদারতার অভাবে আজ সে তাহা রক্ষা করিতে পারিতেছে না। সমগ্র মানবজাতিকে সে নিজেই আহ্বান করিয়া একত্র মিলিত করিয়াছিল ; আজ এই মিলনকে আবার সে নিজেই ক্ষুদ্র লোভ ও স্বার্থ-বুদ্ধির অধীন হইয়া পণ্ড করিতে বসিয়াছে। মানুষের উন্নতিকে অব্যাহত রাখিয়া ভাল ভাবে বাঁচিতে হইলে আমাদিগকে একসাথে বাঁচিতে হইবে—অন্য জাতির শ্বাস রোধ করিয়া যদি বাঁচিতে চাই, তাহা হইলে বিধির অমোঘ বিধান অদ্ভুত উপায়ে তাহার শোধ লইবে এবং অবশেষে কাহারও মঙ্গল হইবে না। ভারত-রূপ কামধেনুর বাঁট আজ একেবারে শুষ্ক হইয়া পড়ায় ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি সকল দেশেরই ক্ষতি ও চিন্তার কারণ হইয়া পড়িয়াছে। পণ্য-বিক্রয়ের সুবিধার জন্যই রাজ্য ও রাজত্বের আয়োজন, সেই জন্যই এত রেষারেষি, এত যুদ্ধবিগ্রহ। কিন্তু সেই পণ্য অর্থ-সামর্থ্য না থাকিলে কে কিনিবে? গোটা দুনিয়ার মাল চালাইবার একটা বড় হাট এই ভারতবর্ষ। এই হাটে যদি তাহাদের মাল বিক্রয় বন্ধ হয় তবে এসব দোকানদারের জাত কি করিয়া বাচিবে? যে ব্যবসা-বাণিজ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর "অবারিত দ্বার" (free trade) নীতির অনুকূল হাওয়ায় অব্যাহত গতিতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রবেশলাভ করিয়াছিল, আজ তাহাকে অস্পৃশ্য-জ্ঞানে নানা কল-কৌশলে বিদূরিত করিতে চাহিলে তাহা রক্ষা পাইবে কিরূপে? আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যকে বাচিতে হইলে আন্তর্জ্জাতিক মনোবৃত্তির আবশ্যক—ইউরোপের স্বার্থকলুষিত তীব্র জাতীয়তার হাওয়া তাহার পক্ষে মারাত্মক।

অবশ্য আর একটি পন্থা আছে—বিদেশীর সহিত সমগ্র ব্যবসা-সম্পর্ক তুলিয়া দিয়া আত্মসর্ব্বস্ব হইয়া বাচা। প্রত্যেক দেশের অভাব ও

প্রয়োজন নিজ দেশ হইতে মিটাইবার আয়োজন ও ব্যবস্থা করা এবং দেশের শিল্প ও বাণিজ্যকে শুধু নিজ দেশের প্রয়োজনে নিয়োজিত করা। আমেরিকা, চীন, ভারতবর্ষ, রুশিয়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদেধনী প্রকাণ্ড দেশ সমূহের পক্ষে এ-পথে চলা তেমন অসাধ্য নহে। কিন্তু ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে এ-পথ বিনাশের পথ। প্রথম কথা, বৎসরে ছ-মাসের খোরাকও ইংলণ্ডের নিজ দেশে উৎপন্ন হয় না। বিদেশের সহিত তাহার বাণিজ্য বন্ধ হইলে ইংলণ্ড অনাহারেই মারা যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের যে-সব পণ্য পৃথিবীর হাট-বন্দর ছাইয়া ফেলিয়াছে, সে-সব তৈরির কাঁচামাল আসে সব বিদেশ হইতে। তাহারই বা কি উপায় হইবে? অন্য দিকে, উল্লিখিত বৃহৎ দেশগুলি ঐশ্বর্য্যের খনি হইলেও শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাহারা অনেকে নূতন ব্রতী ও অনভিজ্ঞ। বিদেশ হইতে আধুনিক কলকব্জা ও অন্যান্য নানা-বিধ সাজ-সরঞ্জাম আমদানি করিতে না পারিলে তাহাদের চলিবে না। সকলের চাইতে বড় কথা এই যে, বিশ্বের সম্পদ ও জ্ঞানভাণ্ডার আজ জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের নিকট সকলের প্রয়োজনে উন্মুক্ত হইয়াছে। আমরা কি চীনাপ্রাচীর খাড়া করিয়া দিয়া নিজ নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ফিরিয়া গিয়া আবার কূপমণ্ডূক হইয়া বসিব? ইহাতে কি জগতের প্রগতিকে শত সহস্র বৎসর পিছাইয়া দেওয়া হইবে না? আমরা নিজ দেশের মধ্যে আত্মসর্ব্বস্ব ও পূর্ণমনস্কাম হইয়া থাকিতে পারিব না; অথচ আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ ও বাণিজ্যকেও স্বাভাবিক পথে চলিতে পদে পদে বাধা দিব—আমাদের বর্ত্তমান বিপত্তির গোড়ার গলদই এই পরস্পর-বিরোধী নীতির অনুসরণে। সুতরাং মানবজাতির স্বাভাবিক বিবর্ত্তন ধারাকে যদি আমরা ঠিক রাখিতে চাই, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে ভাবের ও বস্তুর আদান-প্রদান যদি আমরা অব্যাহত রাখিতে চাই,

তাহা হইলে পরস্পরকে অন্যায় রকমে আঘাত করিবার যত উপায় তাহা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। শুল্ক-প্রাচীর (Tariff Wall) ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। তেলো মাথায় তেল দেওয়া (subsidy) বন্ধ করিতে হইবে। শিল্প-অনুষ্ঠানে নূতন ব্রতী কোন কোন দেশের পক্ষে ও ক্ষেত্রবিশেষে প্রবলের প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য এরূপ প্রাচীরের ও সাবসিডির সাময়িক প্রয়োজন থাকিতে পারে; কিন্তু তাহার প্রয়োগ আমাদের ন্যায় দুর্বল ও অনুন্নত জাতির জন্য যথাসম্ভব সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক এবং তজ্জন্য জাতিসঙ্ঘের (League of Nations-এর) অনুমোদন থাকা সঙ্গত। অবশ্য সেই সঙ্ঘকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে।

সমস্ত গোলমালের মূলোচ্ছেদ করিবার পক্ষে একটি দুঃসাহসিক পন্থা আছে। কিন্তু তাহা যেমনই নূতন তেমনই ধনতান্ত্রিকদের পক্ষে মারাত্মক। পণ্য-বিনিময়ের সময় যে অর্থরূপ দালালটি মধ্যস্থ হইয়া কাজ করেন তিনি সমস্ত অনর্থের মূল; কারণ তিনি বহুরূপী, তাঁহার রূপের বা মূল্যের কিছুই ঠিক নাই। এই দালালটিকে একেবারে বাদ দিয়া পণ্যের সহিত পণ্যের সাক্ষাৎ বিনিময় করিতে পারিলে সব গোলমাল চুকিয়া যায়। মানুষের ভোগের জন্যই শিল্প ও পণ্যসম্ভারের প্রয়োজন—অর্থ পণ্যসম্ভারকে মানুষের নিকট প্রয়োজন ও সুবিধামত পৌঁছাইয়া দিবার একটি সহজ উপায় মাত্র। ইহা ভিন্ন অর্থের অন্য কোন সার্থকতা নাই। তাই প্রশ্ন উঠিয়াছে, এই খামখেয়ালি দালাল-টিকে মাঝে রাখিবার দরকার কি? এই প্রস্তাবে শ্রমিক বা সাধারণ সম্প্রদায়ের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই সত্য, কিন্তু ইহাতে ধনিক সম্প্রদায়ের সমূহ ক্ষতির কারণ রহিয়াছে। সেইজন্যই এরূপ প্রস্তাবে তাঁহারা একেবারে আঁৎকাইয়া উঠিয়াছেন এবং এই পথের পথিক রুশিয়াকে

সকলে মিলিয়া কোণঠাসা করিবার চেষ্টায় আছেন। ধনী অর্থ চায় শুধু ভোগের সামগ্রী সংগ্রহের জন্য নহে, ব্যাঙ্কের খাতায় হিসাবের অঙ্কটাকে যথাসম্ভব বড করিয়া দেখিবার জন্য। ইহা প্রয়োজনের দাবী নহে,—ইহা নিছক লোভ ও যুগযুগান্তের সংস্কার। সাধ মিটাইয়া ভোগ করিবার বিলাস-সামগ্রী ইহাদিগকে দিলেও ইহারা অর্থের মোহ পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। অথচ ইহাদের এই লোভের ফলে দুনিয়ার ধন আসিয়া কতিপয় ব্যক্তির হাতে জড় হইতেছে, কিন্তু ব্যবহারে লাগিতেছে না। কারণ মানুষের ভোগবিলাসিতার সীমা আছে। অন্যদিকে নানাবিধ পণ্যসম্ভার পড়িয়া আছে, অর্থাভাবে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ তাহার নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভাব মিটাইতে পারিতেছে না। বিনিময়ের জন্য তৈরি না হইয়া পণ্যদ্রব্য যদি মানুষের ব্যবহার ও ভোগের জন্য তৈরি হইত এবং দেশের শাসনতন্ত্র যদি তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্যকুশলতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিতরণ করিবার ভার গ্রহণ করিতেন (যেমন আজ রুশিয়ায় চলিয়াছে), তাহা হইলে ধনী-সম্প্রদায়ের ঘরে বসিয়া টাকায় তা দেওয়া বন্ধ হইত বটে, কিন্তু দুনিয়ার বঞ্চিতেরা কিঞ্চিৎ খাইসা-পরিয়া বাঁচিতে পারিত। এই অবস্থায় ব্যক্তিগত ধনে কাহারও অধিকার থাকিবে না। দেশের কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্য গণতন্ত্রের প্রতিনিধিগণের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হইবে—তাহার ফলভাগী হইবে দেশের সকলে সমভাবে যোগ্যতানুসারে। অর্থ থাকিবে না বটে, কিন্তু অভাবও থাকিবে না; কারণ সকলের সকল রকম অভাব মিটান হইবে সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে। ব্যক্তিগত ধনাধিকার কিংবা কর্ম্মক্ষেত্রের স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচার এ-ব্যবস্থায় স্থান পাইতে পারে না; কিন্তু আমাদের নিজেদের গভর্ণমেণ্ট যদি আমা দিগকে খাটাইয়া লইয়া পরম যত্ন ও বিশেষ বিবেচনা সহকারে আমাদের

দৈহিক মানসিক সর্ব্ববিধ অভাব পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক মানবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ মঙ্গল হইবে না কি? যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারাইবার ভয় আমরা করিতেছি, বর্ত্তমান অবস্থায় মানবজাতির সে অধিকার কি পদে পদে ক্ষুণ্ণ হইতেছে না?

এই নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়া রুশিয়া আজ আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছে। সেখানে বেকার-সমস্যা নাই, জিনিষ সেখানে পড়িয়া থাকিতে পায় না। দেশবাসী সকলের সকল অভাব মিটাইয়া যে জিনিষ উদ্বৃত্ত হয় যে-কোন মূল্যে বিক্রয়ের জন্য তাহারা তাহা বিদেশে চালান করিয়া দেয়। ব্যক্তিগত লাভের জন্য জিনিষ তাহারা তৈরি করে নাই, লাভক্ষতি বিচার করিয়া বিদেশে জিনিষ বিক্রয় করিবার তাহাদের তেমন প্রয়োজন হয় না। জিনিষের বিনিময়ে তাহারা বিদেশ হইতে যাহা পায় তাহাই তাহাদের লাভ। ১৯২৯ সালের পর ইউরোপ আমেরিকা সর্ব্বত্র বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ও জিনিষের উৎপাদন হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। একমাত্র রুশিয়ার উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-মন্দার পরেও বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া একদল লোক সমাজ হইতে অর্থের একাধিপত্যকে নির্ব্বাসিত করিতে চাহিতেছেন এবং রুশিয়া-প্রবর্ত্তিত সমাজ ও অর্থনীতির অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের মধ্যে ইহারা ব্যক্তিগত ধনবাদের চিরসমাধির স্বপ্ন দেখিতেছেন।

ধন ও ধনী-সম্প্রদায়কে রক্ষা করিয়া যদি এ অবস্থার প্রতিকার করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমেই ধন বা অর্থের খামখেয়াল ও স্বেচ্ছাচারকে বন্ধ করিতে হইবে। অন্যথা বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার আর অন্য পন্থা নাই। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মুদ্রা, বিভিন্ন

মুদ্রার বিভিন্ন মূল্য, পরস্পরের মূল্য মধ্যে আবার অনিশ্চয়তা, পৃথিবীর মুদ্রাসমষ্টির হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি কি করিয়া মানুষের সকল হিসাবকে পণ্ড করিয়া দিয়া ব্যবসাবাণিজ্যকে খর্ব্ব করে তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ দিয়াছি।* অর্থের এই সর্ব্বনেশে খেলা বন্ধ করিতে হইলে প্রথমেই আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার একান্ত আবশ্যক। সেইজন্যই লড়াইয়ের পর জেনেভা কন্‌ফারেন্সে স্বর্ণমান পুনর্গ্রহণের প্রস্তাব তাড়াতাড়ি গৃহীত হয়। ইহার ফলে স্বর্ণমান পরিহারের দরুন বিভিন্ন দেশের মুদ্রামধ্যে বাট্টা বা বিনিময়ের হার লইয়া যে অনিশ্চয়তার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা বিদূরিত হইল বটে, কিন্তু সকল মুদ্রার সমষ্টিগত মূল্যের স্থিরতা লাভ করা গেল না। কারণ বিভিন্ন মুদ্রামধ্যে পরস্পরের আপেক্ষিক মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেলেও পৃথিবীর মুদ্রা বা অর্থের মোট পরিমাণ স্থির রাখিতে না পারায় মুদ্রামূল্যও স্থির রহিল না। সমগ্র পৃথিবীর মোট মুদ্রার পরিমাণ একটি সংখ্যাদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইলে সকল দেশের গভর্ণমেণ্ট ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের একমত হইয়া এক-যোগে কাজ করিতে হইবে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের মনোবৃত্তি বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ ঘোরতর পরস্পরবিরোধী ও ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সেই সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

বিভিন্ন দেশ ও তাহাদের ব্যাঙ্কসমূহ একমত হইলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আরও একটি কারণে একপ্রকার অসম্ভব। আধুনিক জগতে বাজার-মর্য্যাদা বা credit কিরূপে অর্থের স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্যেক দেশের সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিতে যদিবা সমর্থ হন, কিন্তু এই নিরাকার credit

* "ভারতে মুদ্রানীতি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পদার্থটিকে আয়ত্তাধীনে আনিবেন কি প্রকারে ? কোন্ দেশে কোন্ ব্যক্তির কি পরিমাণ ধার পাওয়া উচিত, তাহাকে কি পরিমাণে ধারে ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার মর্য্যাদা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য বলিলেই হয়। অর্থের পরিমাণকে স্থির রাখিয়া তাহার মূল্য স্থির রাখিবার পথে ইহা একটি গুরুতর অন্তরায়। কিন্তু পন্থা দুরূহ হইলেও সকল দেশের সমবেত চেষ্টায় এই প্রতিবন্ধকতা দূর করিতে না পারিলেও চলিতেছে না। সেইজন্যই সমগ্র পৃথিবীর অর্থ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্টর হাত হইতে তুলিয়া লইয়া একটি কেন্দ্রীয় শক্তির উপর দিবার কথা উঠিয়াছে। পরস্পর বিবদমান জাতি-সমূহের মধ্যে এরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা কতদূর সম্ভব তাহা অবশ্য ভাবিবার বিষয়।

বর্ত্তমান অবস্থার আশুপ্রতিকার করিতে হইলে অধমর্ণ জাতিসমূহের স্কন্ধ হইতে সমরঋণ ও ক্ষতিপূরণের গুরুভার অবিলম্বে তুলিয়া লইতে হইবে। সকলের সম্মিলিত পাপের বিরাট বোঝা শুধু পরাজিত জাতি-সমূহের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়ায় ইহারা আজ মরিতে বসিয়াছে। পৃথিবীর এতখানি ক্রয়শক্তিকে এভাবে নিষ্পেষিত করিয়া রাখিলে ব্যবসা-বাণিজ্য কোন প্রকারেই পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইতে পারে না। কেবল সমরঋণ ও ক্ষতিপূরণের দাবি বাতিল করিলেও চলিবে না—পৃথিবীর যেখানে যত জাতি নিষ্ফল ঋণের চাপে মুষড়িয়া পড়িয়াছে তাহাদিগকেও রেহাই দিতে হইবে। নতুবা পৃথিবীর ক্রয়শক্তিকে যথেষ্ট পরিমাণে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে না। ইউরোপের বহু মনীষীও এ-কথা আজ স্বীকার করিতেছেন। ভারতের বিরাট পূর্ব্ব ঋণের কথা ছাড়িয়া দিলেও বিগত লড়াইয়ের সময় বিনা স্বার্থে ও বিনা কারণে শুধু আমাদের বিধিনির্দ্দিষ্ট অভিভাবকের উপকারের কিঞ্চিৎ

প্রত্যুপকারার্থ আমাদিগকে নূতন করিয়া বিশাল ঋণভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই সব ঋণের চাপ না কমিলে আমাদের আর্থিক উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। কৃষিজাত পণ্যের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হ্রাস পাওয়ায় কৃষিপ্রধান দেশসমূহের ঋণ-মুক্তি অধিকতর আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান অবসাদ দূর করিতে হইলে যাঁহারা টাকা লইয়া গ্যাঁট হইয়া বসিয়া আছেন তাঁহাদিগকেও হাতের টাকা ছাড়িতে হইবে। খয়রাৎ করিবার কথা কেহ অবশ্য তাঁহাদিগকে বলিতেছেন না। একটা অনন্য-সাধারণ কুণ্ঠা ও অবিশ্বাস হইতে তাঁহারা যে-সকল ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে হাত গুটাইয়া বসিয়া আছেন, ইহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। তবেই নূতন ব্যবসার পত্তন হইবে, বাজারে অর্থ নূতন করিয়া চলিতে সুরু করিবে, মানুষের জড়তা ও অবসাদ কাটিয়া গিয়া ব্যবসা-জগতে নূতন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইবে। বনের বাঘ অপেক্ষা মনের বাঘ আমাদিগকে অধিক কাবু করিয়া ফেলিয়াছে; এবং ফলে দুনিয়ার সকল অর্থ বাজার হইতে মানুষের ঘরে আশ্রয় লইয়াছে। এই অর্থ পুনরায় ঘরের বাহির না হইলে মৃতপ্রায় ব্যবসা-বাণিজ্য আর টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। এই সম্পর্কে আরও একটি ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্ত্তমান অনাস্থা ও অবিশ্বাসের ফলে ধারে কার্য্য করিবার সুযোগও একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মানুষকে এই সুযোগ ফিরাইয়া দিতে হইবে; তাহার কর্ম্মক্ষমতার উপর আবার বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। কারণ মানুষের এই মর্য্যাদা (credit) অর্থের প্রয়োজন যে কতখানি মিটাইতে পারে তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মানুষকে তাহার কর্ম্মকুশলতা অনুযায়ী খানিকটা বিশ্বাস না করিলে কেবল নগদ অর্থ দিয়া সকল সময় কাজ করা কঠিন। তাই অর্থের

সঙ্কোচন দূর করিতে হইলে অকাতরে অর্থব্যয় করা যেমন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তেমনই মানুষকে তাহার প্রাপ্য মর্য্যাদা বা credit দান করারও প্রয়োজন হইয়াছে। অর্থব্যয় সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট ও ধনী-সম্প্রদায়ের দায়িত্বই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ; কারণ শক্তি ও সুযোগ তাহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পূর্ব্বে শুধু লড়াই বাধিলে গভর্ণমেণ্ট অজস্র অর্থব্যয় করিতেন। তদ্ভিন্ন সাধারণ অবস্থায় তাহাদের ব্যয়ের ধারা একটা ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কালে দেশের নানাবিধ বিরাট জনহিতকর অনুষ্ঠানের (public utility concern এর) সহিত তাঁহারা সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। রুশিয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্যান্য দেশেও আজকাল গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে, পাব্লিক ট্রান্সপোর্ট, সেচ, খাল-খনন, বৈদ্যুতিক-শক্তি সরবরাহ, জাহাজ-নির্ম্মাণ, সাধারণের বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদি নানাবিভাগের কর্ত্তৃত্বভার নিজহাতে গ্রহণ করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ প্রয়োজনীয় ও লাভবান কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধনীসম্প্রদায়কেও এই সব অনুষ্ঠানে অর্থনিয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে তাঁহারাও লাভবান হইবেন, দেশের বেকারের সংখ্যাও অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। ক্রেডিট প্রতিষ্ঠা ও অর্থব্যয় করিয়া বাজারের ঘাটতি টাকা পূরণ না করিলে এই অসচ্ছল অবস্থা যে কিছুতেই দূর হইবে না, তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই।

কেহ কেহ মনে করেন, শিল্পজগতে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার বর্ত্তমান অবস্থার জন্য অংশতঃ দায়ী। নিত্য নূতন সৃষ্টির ফলে অপ্রয়োজনে যে অর্থব্যয় হইতেছে, প্রকৃত প্রয়োজনে তাহা ব্যয় হইলে জনসাধারণকে এতটা ভুগিতে হইত না। ধনী ক্রেতার অপব্যয় বাঁচিয়া

যাইত, এবং বিক্রেতাকেও নিত্য-নূতন জিনিষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া হয়রান ও নাকাল হইতে হইত না। তাই আজ এমন কথাও উঠিয়াছে যে, কিছুকালের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রতিকারের পথ থাকিলেও তাহা অনুসরণের উপায় নাই। বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে বাঁচিতে হইলে যে দুর্জ্জয় সাহস, উদার বিশ্বাস ও একান্ত সহযোগিতার আবশ্যক তাহা আজ কোথায়? পরস্পরের প্রতি বিভিন্ন জাতীর মনোভাব দেখিলে আমাদের একটি পুরাতন গল্পের কথা মনে পড়িয়া যায়। দুইটি ভদ্রলোক এক ট্রেনে যাইতেছিলেন। উঁহাদের মধ্যে একপাটি চটি বদল হইয়া যায়। এই ভুল ধরা পড়ে একজনার ষ্টেশনে নামিবার পর। ততক্ষণে ট্রেন চলিতে স্থরু করিয়াছে। প্লাটফর্ম্মের যাত্রীটি গাড়ীর যাত্রীকে তাঁহার পাদুকাটি প্লাটফর্ম্মে ফেলিয়া দিবার জন্য চীৎকার করিতে করিতে ছুটিতে থাকেন, এবং গাড়ীর যাত্রীটিও তাঁহার পাদুকাখানি গাড়ীর ভিতর ছুঁড়িয়া দিবার জন্য বলিতে থাকেন। কেহই কিন্তু ভরসা করিয়া অপরের জুতাটি আগে হাতছাড়া করিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে গাড়ীটি প্লাটফর্ম্ম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। প্লাটফর্ম্মের যাত্রীটি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বসিয়া পড়িলেন; গাড়ীর যাত্রীটি জানালা দিয়া ব্যাকুল নয়নে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরিণামে একপাটি চটি লইয়া উভয়কে ঘরে ফিরিতে হইল

দেশীয় শিল্পের অন্তরায়

বর্ষার সন্ধ্যায় কলিকাতার এক সুপরিচিত ব্যবসায়ী বন্ধুর বৈঠকখানায় বসিয়া তাম্রকূট ও চা'য়ের সদ্ব্যবহার করিতেছিলাম। বন্ধুটি বহু অর্থ খোয়াইয়া, অনেক দিনের আপ্রাণ চেষ্টা ও কঠিন পরিশ্রমের পর, ব্যবসায়টিকে দাঁড় করাইতে সক্ষম হইয়াছেন। ইঁহাদের প্রস্তুত কেমিক্যাল্‌স্‌, ঔষধ ও প্রসাধন দ্রব্য বাজারে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। অর্থের অভাব ইঁহাদের এখন আর নাই। অধিকন্তু এই কারখানা হইতে এক্ষণে কতগুলি দেশী লোকের প্রতিপালনের উপায় হইয়াছে।

ইঁহারই অপর একটি বন্ধুও শনিবারের অবসর যাপনের জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেশী বিস্কুটের কারখানার মালিক—সঙ্গে অন্য কারবারও আছে। অবস্থা বেশ সচ্ছল। তার পর আর একটি বন্ধু আসিয়া জুটিলেন; তিনি দেশী ওয়াটার প্রুফের কাজ করেন। তাঁহার কারবারও প্রথম দিককার বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে ভালই চলিতেছে। ইঁহাদের সহিত দেশীয় শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, তখন একটি বন্ধু আমাকে খানিকটা অনুযোগের সুরে বলিলেন,—"মশায়ত অর্থনীতি সম্বন্ধে খুব প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, শুধু বড় বড় থিওরি লইয়া আলোচনা করিয়া কি লাভ? দেশীয় শিল্পের প্রসার কেন আশানুরূপ হইতেছে না, দেশীয় ব্যবসায়ীদের দুঃখ দুর্গতি কিসে দূর হইতে পারে, এত বক্তৃতা ও প্রচার সত্ত্বেও কোথায় সত্যিকারের গলদ রহিয়াছে—এ

সব ক্ষুদ্র বিষয়ে একটু নজর দিন, আলোচনা করুন। তাহা হইলে আমরা যে বাঁচিয়া যাইতে পারি।”

“হাতে নাতে যাঁহারা কাজ করিতেছেন এবং যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারা নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা পরিষ্কার ভাবে না জানাইলে, বাহির হইতে পণ্ডিতি আলোচনা করা ভিন্ন আমরা আর কি করিতে পারি?”—বিনীত ভাবে এই কথা তাঁহাকে জানাইলে, তিনি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্তরায় সম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে কতকগুলি কথা আমাকে বলেন। তাহাই সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করিব।

দেশীয় শিল্পের প্রথম ও চিরন্তন সমস্যা যথেষ্ট মূলধনের অভাব। ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন ব্রতের প্রথম সূত্রপাত এই বাংলায় সুরু হয়। পরে বাংলা হইতে ইহা ক্রমে গোটা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে। সেই সময় হইতেই বাংলার Industrial Renaissance বা শিল্পযুগের আরম্ভ। সেই সময়ে দেশপ্রীতির নূতন প্রেরণায়, ছোট-বড় নানাপ্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান চারিদিকে গড়িয়া উঠিতে থাকে এবং বাঙ্গালী সর্ব্বপ্রথম চিরদিনের দ্বিধা ও সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ে তাহার মূলধন প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এক দিকে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স্, বেঙ্গল নেশন্যাল ব্যাঙ্ক, হিন্দুস্থান-কো-অপারেটিভ্ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি প্রভৃতি বৃহৎ অনুষ্ঠান যেমন তৎকালে প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্য দিকে তেমনি ছোট কলকারখানার তৈরি গেঞ্জি, মোজা, কালি, কলম, নিব্, পেন্সিল, জুতা, সুটকেশ, ট্রাঙ্ক, বাক্স, সাবান, দাঁতের মাজন, ছুরি, কাঁচি, খেলনা, পুতুল, জ্যাম, জেলি, বিস্কুট, প্রসাধন-দ্রব্য ইত্যাদি নানাবিধ স্বদেশী জিনিস আমরা বাজারে প্রথম দেখিতে পাই। উৎসাহের তুলনায় বড় কারখানার উপযোগী মূলধন

যে তখন খুব বেশী পাওয়া গিয়াছিল তাহা নহে; উল্লিখিত অধিকাংশ শিল্পদ্রব্যই স্বল্প পুঁজি বিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টা প্রসূত। উৎসাহ তখন যেমন প্রবল ছিল, মূলধন তদনুপাতে তেমন প্রচুর ছিল না। স্বদেশী যুগ হইতে দেশীয় কারিগর ও শিল্পীদিগকে মূলধনের জন্য যে অসুবিধা ভোগ এবং সংগ্রাম করিয়া আসিতে হইতেছে, তাহার নিবৃত্তি আজও হয় নাই। দেশীয় যৌথ-কারবারের নিস্ফল ব্যর্থতাই ইহার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী। ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাব, রাতারাতি বড় লোক হইবার আকাঙ্ক্ষা, অতিরিক্ত স্বার্থপরতা ইত্যাদি কারণে বাঙ্গালীর স্বদেশী যুগের অন্যতম কীর্ত্তি বেঙ্গল নেশন্যাল ব্যাঙ্কের ভরাডুবি হইয়া গেল; বাঙ্গালীর বুকের রক্ত দিয়া তৈরী বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ ডুবিতে ডুবিতে জনৈক ধনী বাঙ্গালীর অনুগ্রহে কোন প্রকারে রক্ষা পাইল। এই সব অপ্রিয় অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও লড়াইয়ের সময় Currency Inflation বা মুদ্রাসম্প্রসারণ নীতির ফলে কিছু কাঁচা টাকা হাতে পাইয়া এ দেশে যখন একসাথে কতকগুলি যৌথ-কারবার প্রতিষ্ঠার ধূম পড়িল, তখন তাহার মূলধন সংগৃহীত হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, এই সুযোগের কিছুমাত্র সদ্ব্যবহার আমরা করিতে পারি নাই। বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়-সঙ্কোচ সুরু হইবার পূর্ব্বেই, কতকগুলি অপরিণামদর্শী ব্যক্তির কৃত কর্ম্মের ফলে এই সব কোম্পানীর অধিকাংশ জলবুদ্বুদের ন্যায় মিলাইয়া গিয়াছে—পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে—বহু অংশীদারের সর্ব্বস্বের দীর্ঘশ্বাস এবং দেশীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি একটা দারুণ অবিশ্বাস। তাহার উপর আসিয়া চাপিয়াছে বর্ত্তমান এই জগৎ-জোড়া দুর্গতি। আজ যে একদল বাঙ্গালী সর্ব্বস্ব পণ করিয়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান দুঃসময়ের পীড়ন এবং তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের কৃত কর্ম্মের ফল ভাল করিয়াই ভোগ করিতে

হইতেছে। বলিতে গেলে একটিও দেশীয় ব্যাঙ্ক নাই যেখানে তাঁহারা প্রয়োজনে সামান্য অর্থের জন্যও হাত পাতিতে পারেন। দেশীয় ধনী সম্প্রদায়ের দ্বারও তাঁহাদের জন্য রুদ্ধ-প্রায় বলিলেই চলে। কিন্তু সাধু যাঁহার ইচ্ছা ভগবান তাঁহার সহায়; তাই মূলধনের অভাবকেও অতিক্রম করিয়া ইঁহারা নিজ নিজ শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে আজও বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইঁহাদের সমস্যা আজ অন্য রকমের এবং তাহাই এই প্রবন্ধের বিশেষ আলোচ্য বিষয়।

সমস্যাটিকে এক-কথায় আমরা marketing problem কিম্বা জিনিষের বণ্টন বা বিক্রয় সমস্যা বলিতে পারি। মূলধনের বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও স্বদেশী জিনিষ আজ প্রস্তুত হইয়াছে এবং অনেক জিনিষও ভালই হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সমস্যা দাড়াইয়াছে, জিনিষ ক্রেতাদের নিকট পৌঁছান যাইবে কি করিয়া। দেশী জিনিষের প্রতি শিক্ষিত ক্রেতাদের যতই দরদ থাকুক না কেন, দেশীয় দোকানদারগণের কিন্তু ইহার প্রতি একটা চিরন্তন বিরাগ বা বিরূপ ভাব চলিয়া আসিয়াছে। ইহা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, দেশীয় শিল্পের প্রতি ইঁহারা কখনও তেমন প্রাণের টান অনুভব করেন নাই। অবশ্য এইজন্য দেশীয় শিল্পীদের কোন ত্রুটি নাই এ কথা আমরা বলিতেছি না। স্বল্প পুঁজি লইয়া কাজ করিতে যাইয়া অনেক সময়েই দেশী কারিগর বা শিল্পী রীতিমত জিনিষ সরবরাহ করিতে পারেন না। অনভিজ্ঞতা ও অন্যান্য কারণে জিনিষের ষ্ট্যাণ্ডার্ডও সকল সময় স্থির রাখিতে সক্ষম হন না। এইরূপ নানা ত্রুটি তাঁহাদের ছিল এবং এখনও আছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেশীয় শিল্পের প্রতি দোকানদারগণের একটু দরদ থাকিলে তাঁহারা ক্ষতি স্বীকার না করিয়াও দেশীয় শিল্পের অনেকখানি সহায়তা করিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহারা

দেশীয় কারিগরের আর্থিক অসচ্ছলতা ও অতি-আগ্রহের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবার চেষ্টাই সাধারণতঃ করিয়া থাকেন। দেশী জিনিষ ইঁহারা নগদ্ মূল্যে প্রায় কখনও ক্রয় করেন না। যাহাদের জিনিষ দয়া করিয়া রাখেন, তাঁহাদিগকেও নিতান্তই কৃপা করিতেছেন এই ভাবটাই ইঁহারা সাধারণতঃ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিক্রয় করিয়া মূল্য দিবেন দেশী জিনিষের বেলা এইরূপ সর্ত্ত করা হয়। যাহাদের জিনিষের বেশ চাহিদা আছে এবং যাহারা ইঁহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান, শুধু তাঁহাদের সহিত Sightএ অর্থাৎ একটা নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে পর, টাকা দিবার সর্ত্ত করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, এই সর্ত্তও দেশীয় দোকানদারগণ অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা করেন না। অসামর্থ্যই যে সকল সময় ইহার কারণ তাহাও নহে। দেশীয় শিল্পীদের প্রতি দোকানদারগণের যে অহেতুক অবজ্ঞার ভাব আছে, তাহাই সাধারণতঃ এইজন্য দায়ী। অনেক সময় এমনও হয়, দেশী জিনিষের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা উহার কারিগরের বিল না মিটাইয়া তাঁহারা ঐ টাকা দিয়া রবিন্সন্ বার্লি, গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধ কিম্বা ঐরূপ অন্য কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিদেশী জিনিষ নগদ মূল্যে আমদানি বা ক্রয় করিয়া থাকেন; নয় ত উহাদের হুণ্ডির টাকা মিটাইয়া দিয়া থাকেন। ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, আমাদের দোকানদারগণ দেশীয় শিল্পীকে উপবাসী রাখিয়া তাঁহাদেরই প্রাপ্য অর্থ দ্বারা বিদেশী জিনিষের মূল্য জোগাইতেছেন এবং তাহার ফলে দেশী কারিগরের মূলধনের অভাব তাহার জিনিষ বিক্রয় দ্বারাও অনেক সময়ে দূর হইতে পারিতেছে না! ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

এক্ষণে যে দুঃসময় চলিয়াছে, তাহাতে অনেক দোকানদারের অবস্থাও সচ্ছল নহে। এই অবস্থার ফলও পরিণামে দেশীয় শিল্পকেই ভোগ

করিতে হইতেছে। বিদেশী জিনিষের জন্য নগদ মূল্য দিতে হয়; অথচ আজকাল বেচা-কেনা কমিয়া যাওয়ায় ব্যবসায়ে তেমন লাভ নাই। তাই ইঁহারা অনেক সময় দোকানের মূলধন ভাঙ্গিয়া সংসার-খরচ চালাইতে বা দোকানের ঘরভাড়া, ইলেক্‌ট্রিক বিল, এ্যাসিষ্ট্যাণ্টের মাহিনা ইত্যাদি দিতে বাধ্য হন; এবং পরিশেষে দোকানদারের ক্ষতি, আংশিকভাবে হইলেও, দেশীয় শিল্পীর উপর আসিয়া পড়ে; কারণ সকলের দাবী মিটাইবার পর তাহার ভাগেই পড়ে ফাঁকি।

আজকাল এক শ্রেণীর দোকানদার সৃষ্টি হইয়াছে, যাহারা অনন্যোপায় হইয়া দোকান খুলিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে অর্দ্ধশিক্ষিত ভদ্রলোকের সংখ্যাই বেশী; সুশিক্ষিত ভদ্রলোকও আছেন। ইঁহাদের মূলধন নাই, ব্যবসাও জানেন না; কিন্তু দেশীয় শিল্পীদের নিকট ধারে জিনিষ পাওয়া যাইবে, ইহা ভালরূপেই অবগত আছেন। জিনিষ লইবার সময় ইঁহারা যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়া থাকেন এবং ধারে জিনিষ পাইবার যোগ্যতা সম্বন্ধে মধ্যস্থ বন্ধুর সাফাই সাক্ষ্যেরও অভাব হয় না। তার উপর স্বদেশ সেবার সুযোগ লাভের জন্য ইঁহাদের এইরূপ প্রশংসনীয় উদ্যম উপেক্ষা করাও কঠিন! সর্ব্বোপরি, দেশীয় শিল্পীর গরজ বড় বালাই। এইরূপ অনুরোধ উপরোধ লাভ দেশী কারিগর ও শিল্পীর ভাগ্যে সচরাচর বড় ঘটে না। সুতরাং এই সব অনন্যোপায় অনভিজ্ঞ নূতন ভদ্রলোক দোকান-দারগণ তাঁহাদের দোকানের জন্য স্বদেশী মাল পান; কিন্তু যে সব স্বদেশ-বাসী মাল দেন তাঁহাদের অনেকেই মূল্যের টাকাটা পান না। এভাবে বেকার সমস্যা সমাধানেও ইঁহাদের অনিচ্ছাকৃত অবদান নিতান্ত সামান্য নহে!

ভাল বা বড় দোকান সহজে দেশী জিনিষ রাখিতে চায় না। বিজ্ঞাপনের পিছনে অর্থব্যয়, শিক্ষিত ক্রেতার দেশপ্রীতি ও জিনিষের

নিজগুণে কোন জিনিষের চাহিদা যদি নিতান্তই বৃদ্ধি পায়, তখনই কেবল ইঁহারা ঐ সকল জিনিষ রাখিতে স্বীকৃত হন। একে জিনিষ প্রস্তুত ও অন্যান্য আবশ্যকীয় খরচ কুলানই এই সব শিশু শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে দুঃসাধ্য; তাহার উপর বিজ্ঞাপনের ব্যয় বহন করা ইঁহাদের পক্ষে অনেক সময় বোঝার উপর শাকের আঁটি হইয়া পড়ে। অন্য দিকে বহুদিনের পরিচিত বিদেশী জিনিষের বাজারে বিজ্ঞাপনের তেমন আবশ্যক হয় না; আর বিনা প্রয়োজনে বিজ্ঞাপন দিতেও তাঁহাদের অর্থাভাব নাই; মাল চালাইবার জন্য দোকানদারগণকেও তাঁহাদের খোসামোদ করিতে হয় না। শুধু তাহাই নহে। সাধারণের নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষ হইতে আরম্ভ করিয়া বিলাসী ধনীর সৌখীন উপকরণাদি সর্ব্বপ্রকার পণ্যসম্ভার জাপান এরূপ অসম্ভব রকম সস্তায় সরবরাহ করিতে শুরু করিয়াছে যে উক্ত দেশীয় শিল্পের পক্ষে মারাত্মক হইতেই পারে—অন্যান্য শিল্পপ্রধান পাশ্চাত্য দেশের পক্ষেও অত্যন্ত ভাবনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কলুটোলা, রাধা-বাজার ক্যানিং ষ্ট্রীটের বড় বড় দোকানদারগণ সর্ব্বদা এই সব নিত্য নূতন জাপানী মাল সস্তায় আনাইয়া অধিক লাভে বিক্রয়ের আশায় মাথা ঘামাইতেছেন। অন্যান্য জিনিষের সহিত ইহাদের মূল্যের এত পার্থক্য যে, লাভের অঙ্ক বেশী রাখিয়া এই সব জিনিষ বিক্রয় করা অনেকটা সহজসাধ্য। কলিকাতার এইসব বড় বড় পাইকারী দোকান হইতেই মফঃস্বলে মাল চালান হয়; কারণ মফঃস্বলের দোকানদারগণ ইঁহাদের নিকট হইতে নিজেদের প্রয়োজনীয় বৎসরের মাল ক্রয় করিয়া নেন। অনেক দিনের ব্যবসা সম্পর্কের ফলে এবং অন্যান্য নানা কারণে ইঁহাদের মধ্যে একটা বাধ্য-বাধকতার সম্বন্ধ আসিয়া যায়। এবং মফঃস্বলের দোকানদারগণ কলিকাতার ব্যবসায়ীর নিকট হালফ্যাশনের বিষয় অবগত হইয়া অনেকটা তাঁহাদের উপদেশ অনুযায়ী মাল পছন্দ করিয়া

থাকেন। কলিকাতার ব্যবসায়ীকে নগদ মূল্য দিয়া কিংবা সংকীর্ণ সময়ের ম্যাদে মূল্য দিবার সর্ত্তে জাপান হইতে মাল আমদানী করিতে হইয়াছে। সুতরাং ইঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্যই হয় যত সত্বর সম্ভব এই মাল বিক্রয় করিয়া ফেলা। সেইজন্য মফঃস্বলের দোকানদারগণের নিকট ইঁহারা এই সব মাল চালাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এইভাবে বিনা আড়ম্বরে, প্রায় বিনা বিজ্ঞাপনে, এই সব সস্তা জাপানী মাল সুদূর পল্লী-গ্রামের নগণ্য বিপণিতে পর্য্যন্ত সহজেই স্থান লাভ করে।

এখানে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জাপানের মুদ্রা-সম্পর্কীয় নীতি এবং এ বিষয়ে আমাদের কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা জাপানের সহিত আমাদের প্রতিযোগিতার সমস্যাকে আরো জটিল করিয়া তুলিয়াছে। জাপানী ইয়েনের মূল্য ছিল শতকরা ১৫০৲ টাকা। সেই স্থলে স্বর্ণমান পরিত্যাগ ও মুদ্রানীতির শিথিলতা দ্বারা ইহার মূল্য দাড়াইয়াছে একণে মাত্র ৭৫৲।৭৬৲ টাকা! জাপানী মাল এতটা সস্তা হওয়ার ইহাও একটি প্রধান কারণ। জাপানী ব্যবসায়ী তাহার জিনিষের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় এক শত ইয়েনই পাইতেছে কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের রৌপ্য-মুদ্রা ও জাপানের ইয়েনের মূল্যের মধ্যে এতটা তারতম্য হওয়ায় আমাদিগকে ১৫০৲ টাকার স্থলে একণে দিতে হইতেছে মাত্র ৭৫৲।৭৬৲ টাকা! ইয়েনের মূল্য হ্রাস করিয়া দিয়া জাপান এইভাবে আমাদের বাজার নিজ পণ্যে ছাইয়া ফেলিবার অধিকতর সুযোগ পাইয়াছে। সেইজন্যই ভারতবাসী রৌপ্যমুদ্রার মূল্য এক শিলিং ছ' পেনি হইতে, বেশী কম না হইলেও, অন্ততঃ এক শিলিং চার পেনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য এত দরবার, এত আন্দোলন করিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই দাবিটুকু তাহার আজ পর্য্যন্ত পূর্ণ হয় নাই।

ভারতীয় শিল্পীদের আর একটি বিপত্তি এই যে, একই জিনিষ বিভিন্ন দোকানদার বিভিন্ন দরে বিক্রয় করে। ইহাতে ক্রেতাদের মনে নানারূপ সন্দেহের উদ্রেক হয়, এবং বিরক্তিরও কারণ ঘটে। ক্রমে দেশী ব্যবসায়ী ও তাহার জিনিষ উভয়ের উপরই একটা অনাস্থা আসিয়া পড়ে। কোন বিদেশী নামকরা জিনিষের বেলা কিন্তু সমস্ত বাজার ঘুরিয়া আসিলেও দামের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যাইবে না। নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা ঐ সব জিনিষ কেহ কম দরে বিক্রয় করিলে তাহার পক্ষে ভবিষ্যতে মাল পাওয়া কঠিন হইবে। কিন্তু দেশী জিনিষের বেলা অনেক দোকানদার তাহার প্রতিবেশীর খরিদদার ভাঙ্গাইবার জন্য কিম্বা বিদেশী জিনিষের হুণ্ডির টাকা পরিশোধ করিবার তাড়নায়, নিজ ইচ্ছামত লাভের অংশ কম ধরিয়া অথবা নিজের লাভ একেবারে বাদ দিয়া জিনিষ বিক্রয় করে। অনেক দেশী নামজাদা চল্‌তি জিনিষের দরও সেইজন্যই অনেক সময় এক এক দোকানে এক এক রকম দেখিতে পাওয়া যায়।

মূলধনের অভাব, মুদ্রানীতি সম্পর্কীয় অব্যবস্থা, দেশীয় ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ব্যাঙ্কের অসদ্ভাব, অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি গুরুতর প্রতিবন্ধকতার কথা ছাড়িয়া দিলেও দেশীয় শিল্পীগণ তাহাদের উৎপন্ন পণ্যের কাট্‌তি বা বণ্টন সম্পর্কে দেশী ব্যবসায়ীর নিকট অধিকতর সহানুভূতি এবং ব্যবসানুমোদিত সঙ্গত ব্যবহার পাইলে তাহাদের অনেকখানি অশান্তি ও অন্তরায় দূর হইতে পারিত। এই অন্তরায়ের মূলে ব্যবসায়ীগণের ন্যায্য স্বার্থ কিছু বিদ্যমান রহিয়াছে বুঝিতে পারিলেও কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারা যাইত। কিন্তু ইহার মধ্যে অনেকখানি বিপরীত সংস্কার, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি, অন্যায় লাভের আশা আছে বলিয়াই আমাদের পরিতাপের কারণ হইয়াছে। এই অবস্থার আশু প্রতিকার হওয়া আবশ্যক।

আজকাল কেনাবেচার ব্যবসায়ে বহু উচ্চশিক্ষিত দেশ-হিতৈষী লোক প্রবেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমাদের বিশেষ নিবেদন তাঁহাদের কাছে। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই 'গিল্ড' বা সঙ্ঘ হইয়াছে। সেই সঙ্ঘের সমষ্টিগত স্বার্থ-রক্ষার্থ সকলকেই নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। ইহাতে সাময়িকভাবে কাহারও ক্ষুদ্র স্বার্থে আঘাত লাগিলেও, সঙ্ঘের সাধারণ কল্যাণ সাধিত হইয়া পরিণামে সকলের স্থায়ী মঙ্গল সম্ভব হয়। দেশীয় দোকানদার-গণের মধ্যে এরূপ কার্য্যকরী সঙ্ঘের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে নিজেদের মধ্যে একতাবর্দ্ধন দ্বারা অনাবশ্যক প্রতিযোগিতার পথ রুদ্ধ হইবে, সংহতি ও শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, এবং ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও দেশের উপকার করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে।

অন্যদিকে দেশীয় কারিগর ও শিল্পীগণেরও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বিশেষ বিশেষ শিল্পের এরূপ কতকগুলি প্রতিষ্ঠান যে না আছে তাহা নহে। কিন্তু ইহাদের শুধু কাগজপত্রে টিকিয়া থাকিলে চলিবে না—প্রকৃত সংহত-শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। আমরা এমন একটি নামকরা প্রতিষ্ঠানের কথা জানি যাহার কোন কোন সভ্য নিজেদের জিনিষের সর্ব্বনিম্ন মূল্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা স্থির করিবার পরও দিল্লী সিমলা যাইয়া ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া গোপনে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার ও অপরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আসিয়াছিলেন। ব্যবসায়ী ও বিক্রেতাগণের মধ্যে এরূপ ব্যাপার অহরহ হইতেছে। সঙ্ঘের নির্দ্দেশ গোপনে অমান্য করিয়া rate-cutting বা মূল্য হ্রাসের পরিণাম কি তাহা জানিয়াও সামান্য লাভের প্ররোচনায় এভাবে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিতে আমরা কুণ্ঠিত হইতেছি না। ইহা অপেক্ষা কলঙ্কের বিষয় আর কি হইতে পারে? সে কথা থাক্; প্রয়োজন হইলে বড় বড় সহরে

বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগর ও শিল্পীগণকে একত্র মিলিত হইয়া তাহাদের নিজেদেব পণ্যের জন্য একটী বৃহৎ স্থায়ী বিপণির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পরশ্রীকাতরতা, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থজ্ঞান, ভেদবুদ্ধি, অসহিষ্ণুতা এরূপ মিলনের ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় জীবনে চিরদিন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু উচ্চ আদর্শের প্রেরণা ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি এই সব হীন প্রচেষ্টা হইতে আমাদিগকে মুক্তি না দিলে আমাদের আর কোন উপায়ও নাই।

যে দেশে টাকা নাই

সে একদিন ছিল যখন মানুষের অভাববোধ এমন করিয়া জাগ্রত হয় নাই, তাহার প্রয়োজনের তাগিদ এরূপ দুর্ব্বার হইয়া উঠে নাই। "মোটা কাপড়, মোটা ভাত" হইলেই তাহার দিন চলিত। ভগবৎদত্ত প্রচুর নৈসর্গিক ভাণ্ডার হইতে তখনও সে নানাবিধ রত্ন আহরণ করিতে শেখে নাই। পৌরাণিক যুগের কথা বলিতেছি না, মাত্র দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের কথাই বলিতেছি। আমরা আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে নব নব কীর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি, তখন তাহার সামান্য সূচনামাত্র আরম্ভ হইয়াছে। বিশাল পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য করতলগত করিবার কৌশল তখন পর্য্যন্ত মানুষ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। জীবন তখন সহজ ও স্বাভাবিক ছিল; মানুষের সহিত মানুষের, জাতির সহিত জাতির স্বার্থ-সংঘর্ষ তখন সময় সময় কঠিন হইলেও এমন জটিল হয় নাই; জীবন সংগ্রাম এরূপ মারাত্মক হইয়া উঠে নাই। তাই সেদিন মানুষ নিজ নিজ শক্তি ও সুযোগ অনুযায়ী ইচ্ছামত আপন পথ বাছিয়া লইতে পারিয়াছিল; নিজ নিজ সাধনালব্ধ জ্ঞানফল আপন ইচ্ছামত ভোগ করিতে পারিয়াছিল। তাহার জ্ঞান ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত গতিতে চলিবার পক্ষে কোন বাধার সৃষ্টি হয় নাই। সেই পূর্ণ সুযোগ ও স্বাধীনতা লাভ করিয়া মানুষের মধ্যে যাহারা উদ্যোগী ও প্রতিভাশালী তাহারা নানাক্ষেত্রে নিজ নিজ কর্ম্মকুশলতা দ্বারা শিল্পজগতে যুগান্তর আনয়ন করিতে পারিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়া বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হইয়া বসিয়াছিল। এই সব উদ্যোগী কর্ম্মকুশল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অধিপতি-

গণকে Business Entrepreneur বলা হইত। রাজশক্তির তখন একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল প্রজাসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় করা, দেশের ভিতর শান্তি রক্ষা করা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে সুরক্ষিত রাখা। দেশের শিল্পবাণিজ্যের সহিত তাহার কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষের যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল, ইহাকেই ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রে Laissez Faire বা Policy of Non-interference বলা হইত। কতকটা প্রয়োজন ও অবস্থার দায়ে এবং কতকটা জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্বের দরুণ ইংরেজ জাতি শিল্পবাণিজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত উন্নতি করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইংলণ্ডের নৈসর্গিক সম্পদ মোটেই প্রচুর নহে; তাহার দেশে তিন চারি মাসের খোরাকের পরিমাণ শস্য পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয় না। চারিদিকে তাহার সমুদ্র। সাগর পার হইয়া বিদেশ হইতে এই ঘাটতি খোরাক তাহাকে সংগ্রহ করিতে হয় এবং তাহার মূল্য দিবার জন্য শিল্পজাত দ্রব্য তাহাকে বিদেশে পাঠাইতে হয়। সেই প্রয়োজনের তাগিদ হইতেই শিল্প ও বাণিজ্য-ক্ষেত্রে তাহার অর্থ ও শক্তি নিয়োগের আবশ্যক হইয়াছিল সর্ব্বপ্রথম। শুধু তাহাই নহে, এক দিকে খাদ্যশস্য ও শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য কাঁচামাল বিদেশ হইতে আমদানি করা তাহার পক্ষে যেরূপ নিতান্ত প্রয়োজন ছিল, অন্যদিকে ঐ সব কাঁচামাল হইতে যন্ত্রে তৈরি শিল্পসম্ভার বিদেশে রপ্তানি না করিয়া আমদানী জিনিষের মূল্য দিবার ও ধনাগমের অন্য কোন উপায় তাহার ছিল না। সেই জন্যই ইংলণ্ড ছিল অবাধ বাণিজ্যনীতির (Free Tradeএর) একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রয়োজনে শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম অবতীর্ণ হওয়ায় ইংলণ্ডের অনেকখানি সুবিধা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে পশ্চিমের অন্যান্য দেশ—বিশেষরূপে ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও আমেরিকা

—শিল্পজগতে নিজ নিজ শক্তি ও অর্থ নিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে এই যান্ত্রিক-যুগ ও শিল্পোন্নতির সূচনা। নূতন নূতন বিলাস সামগ্রীর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভোগের স্পৃহা ও স্পর্দ্ধা স্বাভাবিক নিয়মে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বিশ্বের সেই নবজাগ্রত বিরাট ক্ষুধা মিটাইবার ভার পাশ্চাত্য দেশের যে সব জাতি গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের আয়োজন, প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই প্রচুর ছিল না। তাই সেই সময়ে বিশ্বের হাটে পাশ্চাত্য ব্যবসাদারগণের মধ্যে বিরোধ ঘটিবার তেমন অবকাশ হয় নাই। উহারা সকলেই নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষের ভোগলিপ্সার খোরাক জোগাইয়া সমভাবে লাভবান হইতেছিল। কিন্তু বিজ্ঞান দেখিতে দেখিতে বায়ু ও বিদ্যুৎকে পদানত করিয়া অসীম ক্ষমতার অধিকারী হইয়া বসিল এবং আলাদীনের দৈত্য অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর ও শক্তিশালী যন্ত্রদানবের সাহায্যে এক এক মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ ভোগসামগ্রী কোটী কোটী লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া ধরিল। তখনই উপস্থিত হইল বিভ্রাট। অবাধ বাণিজ্যনীতির নৌকা ভরা জোয়ারে পাল তুলিয়া চলিতে চলিতে চোরা-বালিতে আসিয়া ধাক্কা খাইল। বড় বড় ব্যবসার মালিকগণ বৎসরের পর বৎসর লাভের অঙ্ক দ্বারা যতটা ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিলেন ভোগলিপ্সা মিটাইবার জন্য ক্রেতাগণের সংখ্যা বা অর্থ সেই পরিমাণে বাড়িতে পারিল না। তাহাতেও কারখানার মালিকগণের চৈতন্যোদয় হইল না, ধনলিপ্সা হ্রাস প্রাপ্ত হইল না, বরঞ্চ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াই চলিল। ফলে এই দাঁড়াইল যে, দুনিয়ার অধিকাংশ ঐশ্বর্য্য ও ধনসম্পদ কতিপয় দেশের কতকগুলি লোকের হাতে আসিয়া জড় হইল। এক দিকে পণ্যসম্ভারের প্রাচুর্য্য, অন্য দিকে জনসাধারণের অর্থাভাব। তখনই সুরু হইল মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে রেষারেষি ও

কঠিন প্রতিযোগিতা। কে কাহাকে পরাজিত করিয়া নিজ পণ্য অপরের নিকট বিক্রয় করিবে, ইহা একটা মস্ত সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। প্রত্যেক মালিক বা ধনী কিন্তু নিজ বুদ্ধি ও খেয়ালমত পূর্ব্ব-অভ্যাস অনুযায়ী স্বাধীন-ভাবেই চলিতে লাগিল। এই অবস্থা-সঙ্কট দূর করিবার জন্য পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ বা সহযোগিতা সম্ভব হইল না। প্রতিযোগিতা যতই কঠিন হইল, একজাতির অপর জাতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া নিজের পথ সুগম করিবার হীন চেষ্টা ততই প্রবল হইয়া উঠিল। ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র চেষ্টা দ্বারা এক দেশের ব্যবসায়ী যখন অপর দেশের ব্যবসায়ীর সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না, তখন সেই দেশের রাজশক্তির পক্ষে আর চুপ করিয়া থাকা পোষাইল না। প্রত্যেক জাতির ও দেশের কল্যাণের জন্য তাহাদের শাসন-তন্ত্রের যে দায়িত্ব আছে তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইল। ফলে অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) ও নির্ব্বিরোধ (Laissez Faire) নীতিকে খর্ব্ব করিয়া পাশ্চাত্য দেশ সমূহের শাসনতন্ত্রগুলিকে নিজ নিজ দেশের ব্যবসায়ীদের রক্ষা ও সাহায্যার্থ নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইল। এই প্রকার চেষ্টা প্রধানতঃ চলিয়াছে তিন উপায়ে—প্রথমতঃ, যাহারা বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে, তাহাদিগকে অনেক ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট সরকারী তহবিল হইতে অর্থসাহায্য (Subsidy) করিতেছেন। এই অর্থসাহায্যের ফলে কারবারের মালিকগণ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে তাহাদের পণ্য বাজারে দিতে পারিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশ হইতে আমদানী মাল যাহাতে সস্তায় বিকাইতে না পারে তজ্জন্য তাহার উপর কর (Tariff duty) ধার্য্য করা হইতেছে। এই দুই উপায় দ্বারাও যখন সুবিধা হইতেছে না, তখন অস্বাভাবিক উপায়ে মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়া দিয়া অন্য দেশ

অপেক্ষা জিনিষের দর (টাকার মাপে) কমাইবার চেষ্টা চলিয়াছে। এই নীতি অনুসরণ করিয়াই ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মাণী ও জাপান প্রভৃতি অনেক দেশ স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছে। যে স্বর্ণমানকে ভিত্তি করিয়া বিশ্বব্যাপী আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য একদিন গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহার উপর সমস্ত পৃথিবীর আর্থিক ব্যবস্থা একদিন নির্ভর করিত, সেই মূলনীতির পরিহার, আর্থিক ও ব্যবসা জগতে যে কত বড় ওলট-পালট ও অস্থিরতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বলিবার নহে। বিগত মহাসমরের সময় জাতির ও দেশের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যখন লোপ পাইবার আশঙ্কা ঘটিয়াছিল তখন যুদ্ধলিপ্ত দেশসমূহ প্রাণের দায়ে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া অর্থের নামে কাগজ চালাইতে একবার বাধ্য হইয়াছিল সত্য। কিন্তু শান্তির সময়েও পুনরায় স্বর্ণমান পরিত্যাগ করায় ইহাদের সমস্যা যে আজ কতদূর গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে তাহা আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। কিন্তু এত করিয়াও শেষরক্ষা হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কারণ প্রত্যেক বুদ্ধিমান জাতিই যদি পরের ঘাড়ে কাঁঠাল ভাঙিয়া খাইবার চেষ্টা করে—তাহা হইলে কাহারও ভাগ্যেই কাঁঠাল ভোজন সম্ভব হইতে পারে না। তাই আজ পরস্পরবিরোধী আত্মঘাতী নীতির ফলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য অসাড় হইয়া পড়িতেছে। এই সমস্যার জবাব আজ য়ুরোপ ও আমেরিকার ধনী সমাজ খুঁজিয়া পাইতেছে না; শুধু অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরিতেছে।

ইহার জবাব দিবার চেষ্টা করিতেছে আজ সোভিয়েট রুশিয়া। এই চেষ্টা যেমনই বিরাট তেমনই অভিনব। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও কর্ম্মবীর লেনিন দেখিলেন, পৃথিবীর একদল লোক সারাদিন খাটিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টি করে; আর

একদল লোক তাহা ভোগ করে। একদল রিক্ত, বঞ্চিত ও নিঃস্ব; মুষ্টিমেয় আর একদল তাহাদেরই সৃষ্ট ঐশ্বর্য্যে ধনী ও বিলাসী। একমাত্র ক্ষমতা ও যোগ্যতার দোহাই দিয়া পৃথিবীর এই বৈষম্যকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। ধনীর অতিরিক্ত স্বার্থপরতা, চরম ভোগলিপ্সা ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনাধিকার জগতের অধিকাংশ মানবকে তাহাদের নিতান্ত সাধারণ ও ন্যায্য সুখস্বচ্ছন্দতা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। ধনী তাহার ভোগের সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে না। দিনের পর দিন ধন সঞ্চয় করিয়া তাহা বিনা প্রয়োজনে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে। এই অর্থ অপরের হাতে আসিতে পারিলে তাহা তাহাদের জীবনের অতি আবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটাইতে পারিত। তাই তিনি ও তাঁহার সমধর্ম্মাবলম্বী সহকর্ম্মীগণ স্থির করিলেন, প্রত্যেক মানুষকে তাহার শক্তি অনুযায়ী সমাজ ও দেশের জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে এবং তাহার বিনিময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ সামগ্রী তাহাকে দেওয়া হইবে। ভোগের অতিরিক্ত ঐশ্বর্য্য তিনি অর্থে রূপান্তরিত করিয়া ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে কিম্বা অধিকতর লাভের আশায় ব্যবসায়ে খাটাইতে পারিবেন না। জগতে টাকা বা অর্থ নামক পদার্থটির সৃষ্টি না হইলে ধনীরা অপরকে বঞ্চিত করিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয়ের সহজ সুযোগ লাভ করিতে পারিতেন না, ইহাও তাঁহারা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেন। পণ্য বিনিময়ের সুবিধার জন্যই অর্থ নামক পদার্থটির একদিন সৃষ্টি হইয়াছিল। মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার দিক দিয়া অর্থের নিজস্ব মূল্য অতি সামান্যই। প্রকৃত সম্পদ বা ঐশ্বর্য্য সংগ্রহের প্রতিনিধিরূপেই ইহার যাহা কিছু মূল্য। কাগজের তৈরি "নোটের" প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার সত্যতা

আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব। কিন্তু শুধু পণ্য বিনিময়ের সুবিধার জন্য যাহার একদিন সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা আজ পণ্যসম্পদকে ছাড়াইয়া উঠিয়া একটা অতিরিক্ত নিজস্ব মর্য্যাদা আপনার জন্য সঞ্চয় করিয়াছে। তাই নব্য রুশিয়ার নূতন কর্ণধার স্থির করিলেন, অর্থ নামক পদার্থটিকে বিশ্বের হাট হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে, মানুষকে সঞ্চয়ের লোভ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। কৃষিকর্ম্ম বা শিল্পবাণিজ্য করিয়া তাহা হইতে কাহারও লাভবান হওয়া ত দূরের কথা; ব্যক্তিগত ধনাধিকারই কাহারও থাকিবে না। লেনিন প্রবর্ত্তিত এই নীতির ফলে—রুশিয়ার সমস্ত কারখানা, কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য ভূসম্পত্তি, জমিজমা আজ রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে চলিয়া আসিয়াছে। সকল ক্ষেত্রে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মূলে আজ রাষ্ট্রের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রুশিয়ার বৃহৎ সাম্রাজ্যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' রূপে রাষ্ট্রই সকলের একমাত্র ভাগ্যনিয়ন্তা এবং স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তির মালিক। নিজেদের জামা কাপড়, পড়িবার বই ও সাধারণ আসবাবপত্র ভিন্ন অন্য কিছুতে কাহারও কোনপ্রকার ব্যক্তিগত অধিকার নাই। প্রত্যেককে নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী দেশের কৃষি ও শিল্পোন্নতির কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের সর্ব্ববিধ অভাব মোচনের ভার রাষ্ট্রই নিজ হাতে গ্রহণ করিয়াছে। রাজশক্তি ভিন্ন রুশিয়ায় আজ অন্য কোন দ্বিতীয় শক্তি বা প্রতিষ্ঠান নাই যাহা পারিশ্রমিক দ্বারা অন্য লোকের নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া লইতে পারে। কাহারও পক্ষে নিজ দায়িত্বে ব্যক্তিগতভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কৃষি কর্ম্মের পরিচালনা করা দূরের কথা, সামান্য জিনিষ কেনাবেচা করা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। কারণ বিদেশের সহিত চালানী ব্যবসা (Export Import trade) কিম্বা দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, সবই রাষ্ট্রের

সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন। কম মূল্যে জিনিষ ক্রয় করিয়া বা বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া স্বল্প লাভে উহা বিক্রয় করতঃ লাভবান হইবার উপায় সে দেশে নাই। রুশিয়ার এই নূতন ব্যবস্থাকে সহজে বুঝিতে হইলে আমাদের এমন একটি দেশের কথা কল্পনা করিতে হইবে যেখানে একটিমাত্র ধনী সমগ্র দেশ জোড়া বিশাল জমিদারী ও কারখানার মালিক এবং অপর সকলে তাহার পরিবারভুক্ত। ধনতান্ত্রিক দেশের মালিকের সহিত তাঁর এইটুকু মাত্র পার্থক্য—তিনি তাঁহার এই বিরাট কারবার হইতে উৎপন্ন লাভের কোন অংশ নিজে গ্রহণ করেন না; লাভের এক অংশ কৃষি ও শিল্পের বিস্তার ও উন্নতির জন্য এবং অপর অংশ যাহারা এই দেশব্যাপী অনুষ্ঠানে কৃষক, শ্রমিক ও শিল্পী হিসাবে কাজ করে—তাহাদের অভাব মোচনের জন্য ব্যয় করা হয়। মালিক ও তাঁহার প্রধান পরিচালকগণ যাহা গ্রহণ করেন তাহা দ্বারা তাঁহাদের সাধারণ অভাব মোচন হয় মাত্র, বিলাসিতা করা সম্ভব হয় না।

এখানে রুশিয়ার অর্থনীতির সহিত পৃথিবীর আর সব দেশের অর্থনীতির যে গুরুতর প্রভেদ তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। বর্ত্তমান সঙ্কটকাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্বর্ণের নিজস্ব একটা মূল্য আছে। কাজকর্ম্মের সুবিধার জন্য প্রত্যেক দেশে নোটের প্রচলন থাকিলেও সরকারী ধনাগার হইতে ইচ্ছামত নোটকে স্বর্ণমুদ্রায় পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া চলিত। সেইজন্য কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপন খুসীমত নোট ছাপাইয়া অর্থ সৃষ্টি করা চলিত না। বর্ত্তমান সময়ে ব্যবসা জগতে যে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে তাহার ফলে যদিও অধিকাংশ দেশ স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া নোটের বিনিময়ে নিজদেশে

স্বর্ণমুদ্রা দিবার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, তথাপি নিজেদের মুদ্রার মর্য্যাদা বিশ্বের হাটে যাহাতে একেবারে বিনষ্ট হইয়া না যায় তজ্জন্য সাধ্যানুসারে স্বর্ণমুদ্রার ব্যবস্থাও রাখিয়াছে। নোটের বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা দিবার যে আইনসঙ্গত বাধ্যবাধকতা ছিল তাহাই শুধু উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই ব্যবসা-জগতে এই সব স্বর্ণ-ভ্রষ্ট মুদ্রার মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। কিন্তু রুশিয়ার মুদ্রা 'রুব্‌ল্'-এর অবস্থা আজ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। স্বর্ণের সহিত ইহার আজ কোনরূপ সম্পর্ক নাই।*

রুশিয়ার বাহিরে অন্যত্র ইহার কোন মূল্যও নাই; কোনরূপ মূল্য থাকে তাহা রুশিয়ার কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রায়ও নয়। রুশিয়ার মুদ্রা যাহাতে বিদেশে যাইতে এবং বিদেশী মুদ্রা যাহাতে রুশিয়ায় প্রবেশ করিতে না পারে তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এইভাবে অর্থের সঙ্কোচন ও প্রসারণ গবর্ণমেণ্টের আয়ত্তাধীনে আনা হইয়াছে। দেশের মধ্যেও অর্থের স্বাভাবিক ব্যবহার ও শক্তিকে নানা প্রকারে খর্ব্ব করা হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট নিজেই দেশের সর্ব্বপ্রধান ক্রেতা এবং প্রায় একমাত্র বিক্রেতা; স্বাধীনভাবে হাটবাজারে জিনিষপত্র ক্রয় বিক্রয় সে দেশে আর নাই; সকল লোককেই সমবায় ভাণ্ডার বা সরকারী ষ্টোর হইতে জিনিষপত্র ক্রয় করিতে হয়। প্রত্যেক জিনিষের মূল্য গবর্ণমেণ্ট হইতে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়া থাকে এবং ইচ্ছা করিলেও বেশী জিনিষ এক সাথে কেহ ক্রয় করিতে পারে না। কারণ শুধু অর্থ দ্বারা সেখানে জিনিষ সংগ্রহ করা যায়

* রুশিয়ার চল্‌তি অর্থের ভিতর সাড়ে তিন শত কোটি রুব্‌ল্-এর শুধু কাগজের নোট; এবং মাত্র পঁচিশ ছাব্বিশ কোটি রুব্‌ল্-এর ব্রঞ্জ, তামা বা রৌপ্য মুদ্রা রহিয়াছে।

না। অনেক জিনিষের জন্য প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী একখানা টিকিট বই দেওয়া হয়। মূল্যের টাকার সাথে এক একখানা টিকিট দিলে তবেই নিতান্ত আবশ্যকীয় জিনিষ ক্রয় করা চলে। মানুষের হাতে যাহাতে অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চিত হইতে না পারে তজ্জন্য সাধারণের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট মাঝে মাঝে ঋণ গ্রহণ করেন। উহাতে প্রত্যেককে টাকা ধার দিতে আইনতঃ বাধ্য করা হয়। বেশী টাকা হাতে থাকিলেই প্রয়োজনের অধিক জিনিষ সংগ্রহের চেষ্টা চলিবে এবং ফলে সকলের পক্ষে নিতান্ত প্রযোজনীয় জিনিষ পাওয়াও দুষ্কর হইবে, এই উদ্দেশ্যেই অতিরিক্ত অর্থ সাধারণের হাত হইতে এই উপায়ে টানিয়া লওয়া হয়।

তাহা হইলে মোটামুটি অবস্থা এই দাঁড়াইল যে, রুশিয়ার অধিবাসীরা অর্থ থাকিলেও দেশে ইচ্ছামত জিনিষ ক্রয় করিতে পারে না। কারণ সকল জিনিষের বিক্রয়ের ভার সরকারী বিভাগের হাতে এবং তাহারা আজও যথেষ্ট পরিমাণ পণ্যসম্ভার নিজেদের দেশে প্রস্তুত করিতে পারিতেছে না বলিয়া টাকা থাকিলেও ইচ্ছামত সকলকে জিনিষ কিনিতে দেওয়া হয় না; পরিমিত পরিমাণ আবশ্যকীয় জিনিস যাহাতে সকলে পাইতে পারে শুধু তাহারই চেষ্টা করা হয়। সেই জন্যই দেশের মধ্যেও তাহাদের অর্থের যেটুকু ক্রয় শক্তি আছে, তাহাও ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। বিদেশ হইতেও তাহারা জিনিষ ক্রয় করিয়া আনিতে পারে না। কারণ প্রথম কথা, তাহাদের টাকা বিদেশে একেবারে অচল—শত 'রুবল্'-এর বিনিময়ে বিদেশী ব্যাঙ্ক তাহাদিগকে একটি কপর্দ্দকও দিবে না বা বিদেশী দোকানদার একমুষ্টি জিনিষও বিক্রয় করিবে না। দ্বিতীয় কথা, বিদেশ হইতে জিনিষ আমদানি করিবার অধিকারও তাহাদের নাই; সেই অধিকার একমাত্র গবর্ণমেণ্টের।

এই অবস্থায় রুশিয়ার প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদের এতদিনকার পরিচিত অর্থের যে কতটা আকাশ পাতাল প্রভেদ তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা হইলে এই মূল্যহীন পদার্থটীকে রাখিবার সার্থকতা কি? সার্থকতা কিছু আছে। প্রত্যেকের খাটুনির পরিমাণ ও মূল্য নিরূপণ করিবার জন্য কোনরূপ একটা নিদর্শনের আবশ্যক। জাহাজে মাল বোঝাই করিবার সময় যেমন প্রত্যেক কুলীর হাতে বোঝা পিছু একটি করিয়া "চাক্তি" নিদর্শন স্বরূপ দেওয়া হয় 'রুবল্'-এর প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতাও অনেকটা ঐরূপই। ইহাকে মজুরির টিকিট (labour ticket) মনে করিলে কিছুমাত্র অন্যায় করা হইবে না। আরো একটা সার্থকতা ইহার আছে। ইহার সাহায্যে বিরাট সরকারী কাজকর্ম্মের আয়-ব্যয়ের একটা হিসাব রাখার সুবিধা হয়—প্রত্যেক বিভাগের বা কারখানার লাভ ক্ষতি বুঝিতে পারা যায়; কর্ম্মের শিথিলতা, ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ধরা পড়ে এবং কর্ম্মের যোগ্যতা (efficiency) পরিমাপ করা সহজ হয়। অর্থের মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে প্রয়োজনীয় ভোগ বা বিলাস-সামগ্রী ক্রয় করা নহে—স্বকল্পিত একটি মাপকাঠি দ্বারা কাজকর্ম্মের একটা হিসাব ঠিক রাখা।

এই অর্থশূন্য অর্থের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা আরও সঙ্কুচিত করিবার ব্যবস্থা চলিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের বাসের জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বড় বড় গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে; উহাতে আধুনিক ফ্যাশনের ফ্ল্যাট থাকিবে। একই কারখানার বা স্থানের কর্ম্মী ও শ্রমিকগণ ঐ সব ফ্ল্যাটে থাকিতে পারিবে এবং তৎসংলগ্ন সাধারণ ভোজনাগারে আহার পাইবে। এতদ্‌ভিন্ন বৈদ্যুতিক আলো, আগুন ও অন্যান্য

প্রয়োজনীয় জিনিষও সকলকে সরববাহ করা হইবে। পড়িবার জন্য পাঠাগার, অবকাশরঞ্জনের জন্য ক্লাবগৃহ, শিশুদের জন্য নার্সারি—সব বন্দোবস্তই তাহাতে থাকিবে। বড় বড় কারখানায় এই সব বন্দোবস্ত ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে। অর্থের বিনিময়ে মজুরি বাবদ প্রত্যেকে এক একখানা সেভিংব্যাঙ্কের বইমাত্র পাইবে। উহাতেই মজুরী বা মাহিনা জমা হইবে এবং উহা হইতেই কর্তৃপক্ষ এই সব খরচের টাকা কাটিয়া লইবেন। এই ব্যবস্থা সমগ্র দেশে বিস্তার লাভ করিলে রুশিয়ার অধিবাসিগণকে আর টাকার মুখ দেখিতে হইবে না—হিসাবের খাতাতেই তখন তাহার একমাত্র স্থান হইবে।

সাধারণ পাঠকের মনে এই প্রশ্নও জাগিতে পারে, বিনা অর্থে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সমগ্র দেশের কৃষিকর্ম্ম ও শিল্পবাণিজ্য পরিচালনা করা কি প্রকারে সম্ভব? আধুনিক উপায়ে ইহাদের উন্নতি সাধন করিতে হইলে অনুন্নত রুশিয়াকে অন্ততঃ কিছু কাল বিদেশ হইতে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য অনেক জিনিষ আমদানী করিতেই হইবে। তাহার মূল্য সে দিবে কি করিয়া? আর যে ব্যাপার সে ফাঁদিয়া বসিয়াছে, সে ব্যাপার ত সামান্য বা সাধারণ নহে, একটা বিরাট অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। যে দেশ শিক্ষাদীক্ষায়, শিল্পবাণিজ্যে, কৃষিকর্ম্মে—সর্ব্বক্ষেত্রে আমাদের মতই দীনতা ও হীনতার গভীর পঙ্কে ডুবিয়া বিশ্বের করুণার পাত্র হইয়া ছিল, তাহাকে আজ সর্ব্ববিষয়ে অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের সমকক্ষ করিয়া ত তুলিতেই হইবে; অধিকন্তু ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য মোচন করিয়া সকলকে সমান অধিকার ও সমান সুযোগ দিতে হইবে। তাই বিরাট এক কর্ম্মতালিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়া সমগ্র দেশ একদিল হইয়া কর্ম্মে লাগিয়া গিয়াছে। প্রথম পঞ্চম বার্ষিক প্ল্যানের নির্দ্ধারিত অনেক কর্ম্ম সময়ের পূর্ব্বেই সম্পন্ন

হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহার দ্বিতীয় অধ্যায় চলিয়াছে। যেরূপ সামরিক রীতি ও শৃঙ্খলার সহিত কাজ চলিয়াছে, তাহাতে মনে হয় ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই এই প্ল্যানের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মও সম্পন্ন হইয়া যাইবে। সনাতনী পণ্ডিতদেব মধ্যে যাঁহারা রুশিয়ার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া বিদ্রূপ ও অবিশ্বাসেব হাসি হাসিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ মস্তক কণ্ডুয়ন করিয়া ভাবিতে সুরু করিয়াছেন, "তাই ত! টাকাকড়ি, ঘরবাড়ী, চাকবি নোকরি কিছুবই ভাবনা ইহারা ভাবিতেছে না! তবে কি আমাদেব সকলেব উপর টেক্কা দিয়া সত্য সত্যই ইহাবা একটা নূতন রকম মানব-সভ্যতার সৃষ্টি করিবে না কি!"

মূল প্রশ্নের উত্তব এখনো আমাদেব দেওয়া হয় নাই। আমাদের প্রশ্ন,—যে দেশে টাকা নাই, যে রাজকোষ স্বর্ণশূন্য, সেখানে এ-সব রাজসূয় যজ্ঞের খরচ আসিবে কোথা হইতে? প্রথম কথা, খরচের জন্য দেশে তাহার অর্থের দরকার হয় না। সাধারণেব দ্বারা কাজ কবাইয়া লইয়া তাহাদিগকে তাহাদের জীবন-ধারণের উপযোগী প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দিলেই চলে। কৃষি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যকীয় যে-সব জিনিষ দেশের মধ্যে ক্রয় করিতে হয় তাহার মূল্যও "অপদার্থ" অর্থ দ্বারাই দেওয়া চলে। কারণ সব প্রতিষ্ঠান, সব কল-কারখানাই যখন গভর্ণমেণ্টের এবং গভর্ণমেণ্টই যখন সকল জিনিষের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিরা দেন, তখন এক বিভাগের প্রয়োজনীয় জিনিষ আর এক বিভাগ হইতে ক্রয় কর। অর্থ—হিসাবে জমা-খরচ করিয়া লওয়া এবং ইহাও করা হয় শুধু প্রত্যেক বিভাগের বা কাববারের অবস্থা বুঝিবার সুবিধার জন্য বা একটা হিসাব ঠিক রাখিবাব জন্য।

দেশের দেনা পাওনা সম্বন্ধে না হয় এ ভাবে কাজ চলিল। কিন্তু বিদেশ হইতে আমদানী জিনিষের মূল্য দিবার কি হইবে? স্বর্ণমুদ্রা

(gold coin) বা স্বর্ণথান (gold bar) তাহার নাই, যাহা দ্বারা সে বিদেশের দেনা শোধ দিতে পারে। তাই যে পরিমাণ পণ্য বিদেশে রপ্তানি করিলে উহার মূল্য দ্বারা বিদেশী দেনা বিদেশী অর্থে পরিশোধ করা চলে, সেই পরিমাণ পণ্যই সে বিদেশে চালন করে। বাণিজ্যের গতি (Balance of Trade) তাহার অনুকূলে রাখিবার জন্য বা ধনাগমের জন্য বিদেশে পণ্য পাঠাইবার তার আবশ্যকতা নাই। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, রুশিয়ার নব্যশাস্ত্রে অর্থের স্থান নাই, অর্থের কোন প্রয়োজন নাই। তার প্রয়োজন পণ্যসম্পদের এবং সেই পণ্যসম্পদ সে নিজ দেশেই সৃষ্টি করিতে চায় দেশের লোকের সাহায্যে। বিদেশ হইতে নিতান্ত যাহা না আনিলে নয় তাহাই সে আনে। এবং তাহা ভোগের বা ব্যবহারের জিনিষ নহে, কৃষির উন্নতির বা নব নব শিল্পের প্রতিষ্ঠান জন্য অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতি, যাহা আজো সে নিজ দেশে তৈরি করিয়া উঠিতে পারে নাই।

মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক্। জিনিষ প্রস্তুত করিতে তাহার টাকা লাগে নাই। তাই বিদেশী দেনা পরিশোধের জন্য বিদেশের হাটে জিনিষ বিক্রয় করিবার সময় মূল্য সম্বন্ধে তাহাকে অতটা হিসাব করিয়া চলিতে হয় না। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অন্য দেশ অপেক্ষা কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা তাহার পক্ষে সহজ; কারণ লাভ ক্ষতি তাহার টাকা দিয়া পরিমাপ করিবার প্রয়োজন হয় না—জিনিষের পরিমাণ দিয়া মাপ করিতে হয়। অবশ্য মূল্যের বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত কম জিনিষ দিতে পারিলে অতিরিক্ত জিনিষটা তাহার দেশের প্রয়োজনে আসিতে পারে।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে আমরা এইটুকু বুঝিতে পারিলাম,

করিতে পারে তাহা দ্বারা এবং জিনিষের দোষ-গুণ দ্বারা সে তাহার বিচার করে। দেশে কৃষি ও শিল্পের যতই উন্নতি সাধিত হইবে, যতই অধিক ভোগ-সামগ্রী দেশে প্রস্তুত হইতে পারিবে ততই তাহা অধিকতর পরিমাণে দেশের লোকের ভোগে আসিবে, তাহাদের জীবন-যাত্রার শ্রীবৃদ্ধি করিবে। রুশিয়া বিরাট দেশ, মহাদেশ বলিলেও চলে। তাহার আয়তন আশী লক্ষ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা প্রায় সাড়ে [illegible] কোটি। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সকল অভাব মিটাইবার মত আয়োজন করিতে তাহার আরো বহু বৎসর লাগিবে। তাই রুশিয়া দিবারাত্রি সমস্ত লোককে কাজে খাটাইয়াও সব অভাব মিটাইতে পারিতেছে না; আর অন্যান্য দেশের ইংরাজ প্রভৃতি ভূতের বোঝার মত তাহাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। তাহার কারণ, অন্য দেশ জিনিষ তৈরী করে স্বর্ণের বিনিময়ে অন্য দেশে বিক্রয় করিবে বলিয়া, রুশিয়া জিনিষ তৈরী করে নিজের দেশের লোকের ভোগের জন্য বিক্রয়ের জন্য নহে। যেদিন রুশিয়া তাহার দেশের সকল লোকের সমস্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিবে, সেইদিন সে বিশ্রাম গ্রহণ করিবে এবং সেইদিন পৃথিবীর এই নূতন সাধনা পূর্ণ সাফল্য লাভ করিবে।

রুশিয়ার নব্য তন্ত্রের কথা যত সহজে বলা হইল, কার্যতঃ তত সহজে তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিপ্লবের এবং ভীষণ অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়া রুশিয়াকে বিগত সপ্তদশ বর্ষ চলিতে হইয়াছে। জারতন্ত্রের মূলোচ্ছেদের পর ভিতরের ও বাহিরের শক্তিশালী শত্রুর আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র হইতে তাহাকে সতর্ক পাহারায় আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হইয়াছে। "আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার জমি" মানবের এই চিরন্তন স্বার্থ বাসনার মূলোচ্ছেদ, যুগ-যুগান্তের সংস্কারের পরিবর্ত্তন ভাল কথায় মুখের উপদেশে শুধু